

সম্প্রীতি



Sampriti 2025-26





সূচিপত্র

Foreword

কবিতা

ঘর	অলোকা ভট্টাচার্য
তুঙ্গভদ্রার তীরে	নির্মল দে
ক্যাম্পাস থেকে রাজধানী	বিজন কুমার সিংহ
মুখোশ	মনখুশী
শরৎ	ঋত্বিক সেনগুপ্ত

ছোট গল্প

অথ চশমা ঘটিত	দেবদত্ত রায়
অঙ্কুতুড়ে	প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
বিকেলের চা	ঋত্বিক সেনগুপ্ত
মরীচিকা	সুমিত রায়
সত্যিই তো !!	গোপা বিশ্বাস
আমি আর ছায়া নই	সৌমিত্র ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ

অতীতের টেস্ট ক্রিকেট:	
রূপ, রস, গন্ধ	প্রদীপ্ত দত্ত
সমাজসেবী	ডঃ অমলেন্দু দত্ত
ছিল নিরীহ পতঙ্গ,	
হয়ে গেল আতঙ্ক	অলোক দাশগুপ্ত
ফিরে দেখা	মৈত্রেশী মিত্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের	
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	
বিভাগের কর্মবিবর্তনের গল্প	বিজন কুমার সিংহ

ভ্রমণ কাহিনী

আন্ধারভাটের আনাচেকানাচে	সুদেষ্ণ দাশ
	ও অর্ণব মুখার্জী
বাদামীতে কয়েকদিন	অনুপ কুমার দাস

২

Poem

Simple Thoughts	Partha Sarathi Mandal	৫৪
Oceanus	Adwaita Biswas	৫৫
Pantheist Prayer	Aishwi Mitra	৫৫
Sometimes	Shrabani Biswas	৫৬
The Tame Tears	Mankhushi	৫৬

৪

Short Story

৫

Essence of Life	Nandita Saha	৫৭
-----------------	--------------	----

Essay

Mitochondria: An Unrepayable Debt to My Mother	Arpita Ghosh Mitra	৫৯
Gratitude	Krishnendu Kishore Dutta	৬১

Travelogue

Char Dham Yatra	Prasun Kumar Dutta	৬৩
Mesmerizing Spain & Fascinating Portugal	Susmita Ray	৬৫
Australian Sojourn	Cdr Samir Roy Choudhury (Retd)	৩৫

Memory Collage Random Thoughts on My Offering of Photos	Utpal Kanti Deb	৩৯
---	-----------------	----

Painting

Adhirit Bhattacharjee	৩১
Abhigyan Biswas	৩২
Debarati Malakar	৩৩

Photos

Sriya Malakar	৩৪
---------------	----



অম্পিত ২০২৫-২৬

Foreword

Relatively new to the inner workings of the Alumni Association of NCE Bengal Jadavpur University (AANCEBJU), Delhi Chapter, I have recently taken on the role of Vice President-designate. This engagement has rekindled fond memories of a literary magazine once published by the association, to which I had the privilege of contributing a story. If memory serves me right, the magazine was titled “ছায়াপথ”. Unfortunately, its publication was discontinued in the wake of the COVID-19 pandemic. Jadavpur University has long upheld a rich tradition of nurturing cultural and literary excellence. Both Bengali and English literature formed an integral part of the curriculum, even within core engineering disciplines. We were fortunate to learn from eminent and distinguished teachers, whose classes were far more than academic obligations—they were inspiring experiences. Many of them were stalwarts of West Bengal’s vibrant cultural landscape.

It was from this spirit of learning and inspiration that the idea of an annual literary magazine first emerged. Guided by that vision, the publication was initiated and became a cherished platform for creative expression.

The present Executive Committee has resolved to revive this valued tradition and restore it to its former glory. We are pleased to announce the resumption of the annual literary magazine from this year onward. It is our sincere aspiration that this initiative will continue to reflect and celebrate the rich cultural heritage and traditions we hold dear.

The enthusiastic response from our members has been truly heartening and has further strengthened our resolve. We have received a diverse array of contributions—ranging from reflections on professional journeys to nostalgic reminiscences and various creative expressions.

With your continued support, we are confident that this tradition of the JU Alumni Association, Delhi Chapter will flourish in the years to come.

Pradipta Dutta
(ChE, 1973)

Editor: pradipta Dutta
Co-editor: Anup Kumar Das, Subhra Das
Front Cover Painting: Srabani Biswas



ঘর

অলোকা ভট্টচার্য

ঘর কাকে বলে?
 প্রশ্ন উঠেছে মনে,
 কেমনে বোঝাই ঘরের পরিভাষা?
 ‘ঘর হ’ল, সেই জা’গা,
 যেখানে বাস করে কিছু লোক,
 নিয়ে ছোট আশা, প্রত্যাশা।
 না, না, এটুকুতে ভরে না মন,
 ‘ঘর’ হ’ল অনেক বড়
 আছে প্রেম, অভিমান,
 আর ভালোবাসা।
 এই যদি হয় ‘ঘরের’ পরিভাষা;
 তবে সেত ‘ঘর’ নয়! সে’ত ছবিঘর।
 ‘ঘর’ কি কখনও হয়,
 বিনা ঝগড়ায়!
 রাগরাগি, কাড়াকড়ি,
 তবেই না ঘর।
 ‘ঘর’ হ’ল কামনা,
 ‘ঘর’ হ’ল বাসনা,
 মনের আকুলতা, জীবনের প্রেরণা,
 ‘ঘরেই’ করি যে মোরা স্বপ্ন বোনা।
 চাওয়া-পাওয়া,
 দেওয়া-নেয়া,
 ‘ঘর’ হ’ল সে আনয়,
 যেখানে আসে—
 শোকের পরে শান্তি, রাগের পরে তৃপ্তি,
 কান্নার পরে হাসি।
 তাই না, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা
 সবাই ‘ঘর’-কে ভালোবাসি।

(International Relations, 1987)

তুঙ্গভদ্রার তীরে

নির্মল দে

(BEE, ২০০৪)

কিরে
 যাবি নাকি তুঙ্গভদ্রার তীরে?
 এই বলে মিশে যাব মানুষের ভীড়ে।
 তুই চকিতে পিছনে তাকাবি,
 প্রেম অভাবি,
 কত স্মৃতি আসবে ফিরে ফিরে।
 কাঁচের মতো জল,
 পারের সবুজ বন,
 নির্মল আকাশ।
 আর ঐ গোল গোল নৌকাগুলো-
 যার কোনো দিক নেই।
 তারি কোনো একটাতে চড়ে
 অনন্ত ঘূর্ণিতে,
 ডুবে যাবো অতীত গভীরে।।



সম্প্রতি ২০২৫-২৬

ক্যাম্পাস থেকে রাজধানী

বিজন কুমার সিংহ
(EE, ১৯৮২)

যাদবপুরের পথে পথে
হাওয়ায় মেশে নরম গান,
চোখে চোখে গল্প লেখা-
নীরবতায় লুকায় প্রাণ।

ক্যাফেটেরিয়ার কোণে বসে
চায়ের কাপে স্বপ্ন ভাসে,
তোমার হাসি রোদের মতো
আমার দিনটা আলোক হাসে।

লাইব্রেরির চুপচাপ ঘরে
পাতা ওল্টায় মনের কথা,
হঠাৎ করে হাতটা ছোঁয়া-
বুকের ভেতর ঢেউয়ের ব্যথা।

বৃষ্টিভেজা সেই বিকেলে
এক ছাতায় দু'জন হাঁটা,
যাদবপুর যেন ভালোবাসার
চিরচেনা মিষ্টি কথা।

দিন ফুরোলেও স্মৃতিগুলো
থাকবে হৃদয় জুড়ে ভর,
যাদবপুর মানেই তুমি-
আর তোমাতেই আমার ঘর।

মুখোশ মনখুশী

প্যাণ্ডেলের বাইরে একটা বাঁশের উপর ঝুলত,
পাশে থাকত একজন -
লাফাতে লাফাতে কিনতাম বাঘ ভাল্লুক সিংহ,
আর মুখে পড়ে ভয় দেখাতাম সবাইকে।

এই ভয় দেখানোর মাঝে
কখন যে চশমা বা ক্লিপে লেগে
ছিঁড়ে যেত মাথার পিছনের সুতোটা,
তা কখনও টের পাইনি।

তবে আজ পাই,
আজ পাই টের-
কখন সামনের মানুষটার মাথার পিছনের সুতোটা
ছিঁড়ে যায়, বাস্তবতার ঘেরাটোপ অথবা
সংযমহীন মানসিকতায় লেগে,
সে বোঝে না, অথচ
অসাবধানে খসে পড়ে তার মুখের মুখোশ।।

(D/O Bidyarthi Dutta, PhD,
Library & Information Science, 2008)



শরৎ

ঋত্বিক সেনগুপ্ত
(Arch, ১৯৯৩)

আজ আবার শরৎ এসেছে,
আরবারের মতো,
উৎসবের গন্ধে ভেসেছে,
মাঠ, পথ, বারান্দা আর জানালার কাঁচ।
বয়স পেড়িয়ে দশক-পাঁচ!
মনে-আর মাথাতে বারবার,
বিতর্ক উজাড়-
জীবনের এখন তো শরৎকাল বটে,
কিছু যদি বেহিসেবি ইচ্ছে এসে জোটে,
অনিয়ম, অসময় অচেনা সাময়িক যতো,
খেয়ালগুলো, একবারের মতো,
যদি পাথেয় করে,
খুশীর মেঠোপথ ধরে দেই ছুট,
একদিন ভুলে গিয়ে রোজকার রুট।।
কিছু চেনা সাথে নিয়ে,
আর যে ছুটতে রাজি আছে,
চল ছুটে নিয়ে আসি শরৎ কুড়িয়ে-
ঝোলা ভরে গান, আকাশ আর শিউলির রঙ আনব ভরে।
দেখি নয় একবার ক'রে-
আত্মীয় এসে ঘরে, দেবে পরিচয়,
শরতেও বসন্তের খুশীর উদয়।
যদি একটা শরৎ রেখে বাজী,
বেনিয়মি খেয়ালগুলো করতে থাকো রাজি।



অথ চশমা ঘটিত

দেবদত্ত রায়

(EE ১৯৮২)

চোখে পাওয়ার থাকলে, চশমা দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। চল্লিশ বছর বয়সের পর অনেকেরই চালশে হয়, তখন দরকার চশমা। ছোটবেলাতে যাদের চোখে চশমা থাকে, তাদেরকে সাধারণত বেশ পড়ুয়া ও শান্তশিষ্ঠ গোছের ধরে নেওয়া হয়। আমার দাদু, বাবা সবারই চশমা ছিল। দাদুর দেখতাম একটা রিডিং গ্লাস, অন্যটা দূরে দেখার। বাবা পরত বাইফোকাল। দুটো কাচের জোড় পরিষ্কার বোঝা যেত। আমার চশমার সঙ্গে পরিচিতি বছর বার তের, মানে যখন আমি নিয়ার ফিফটি। অফিসের ম্যান্ডেটরি হেলথ চেকআপে জানা গেল চোখে ‘পাওয়ার’ হয়েছে। আমাদের লোকাল মার্কেটে তখন একটা চশমার দোকান ছিল। বেশ হাসিমুখ ছেলেটির পদবী ছিল ঠুকরাল। গিম্মির চশমাটাও ওর বানান। দোকানে যেতে বলল - স্যার, আপ প্রোগ্রেসিভ লেন্স লিজিয়ে, এটা দূর ও কাছের দূরকম পাওয়ারের জন্য কাজ করবে। দামটা একটু বেশি। লেন্সের দামই সাড়ে তিন হাজার। একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম, আধাসরকারী কোম্পানিতে চাকরী করি। মেডিক্যাল খরচা বৌ, বাচ্চা, ছেলে, মেয়ে এমনকি বাবা মায়ের জন্যও শূন্য। খালি চশমার টাকাটা নিজের গ্যাটের কড়ি খরচা করে বানাতে হবে। গিম্মির পীড়াপিড়িতে ওই প্রোগ্রেসিভ লেন্স নেওয়া ঠিক হল। এরপর ফ্রেম সিলেক্ট করার পালা। ভারী ফ্রেম নিলে তো কষ্ট হবে, কারণ চশমা তো আগে ব্যবহার করিনি। রিমলেস চশমা নেওয়াই ঠিক করলাম। পরেও খুব একটা ফিলিং হচ্ছে না যে চশমা পরে আছি, বন্ধুবান্ধবরা অতটা বুঝবে না যে চোখ খারাপ হয়েছে,

অহেতুক প্রশ্রবান থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

চশমা নাকি খুব হারিয়ে যায়। এটা আবার মোবাইলের মতো নয় যে, বাড়ির অন্য ফোন থেকে রিং দিয়ে খুঁজব। চশমা হারানোর ব্যাপারে সুমিতার খুব হাতযশ। দুরূহ সব জায়গা থেকে ওর চশমা উদ্ধার হয়েছে, যেমন ধরুন ডীপফ্রিজ, আলমারির লকার ইত্যাদি। এখন ওর ব্যাকআপ প্রোটেকশনের জন্য তিনটে চশমা, অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক্যালের ব্যাকআপ রিলের মতো। আমার একমোবদ্বিতীয়ম চশমা ভালোই চলছিল, যদিও মাঝে দুবার চশমা পাল্টাতে হয়েছে। একবার তো হোলির দিনে বেল বাজতে, তাড়াহুড়ো কোরে পড়শীর সঙ্গে আবির্ খেলতে গিয়েছি চশমাটা বিছানার উপর খুলে। পরে এসে বিছানায় বসতেই মটাৎ করে আওয়াজ, চশমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। আরেকবার তখন বাংলাদেশে পোস্টেড। বেনাপোল থেকে মংলা গেস্টহাউসে আসছি। স্পষ্ট মনে আছে চশমাটা খুলে গাড়ির সিটে রেখেছিলাম। রুমে এসে বসেছি। সুমল বলে ছেলেটা মালপত্র নিয়ে এল। দেখি চশমা আনেনি। বললাম গাড়ির সিট থেকে চশমা নিয়ে আয়। সে ঘুরে এসে জানাল কোনো চশমা নেই। সত্যিই আর পাওয়া গেল না। বাড়ি থেকে আরেকটা বানিয়ে পাঠান অর্দি চাইনিজ রিডিং গ্লাসই ভরসা। আগে আমাদের দেশেও এই রিডিং গ্লাস খুব পাওয়া যেত, পেনের মতো পকেটেও রাখা যেত।

সেই চশমার বয়স এখন পাঁচ। দিব্যি চলছিল। তবে আজকাল ফ্লুগলো কিছুদিন পর ঢিলে হয়ে যায়। আগে ঠুকরালের দোকানে গিয়ে টাইট করিয়ে আনতাম। বেশ



কয়েকমাস হল ওর দোকান বন্ধ। কিছুদিন আগে ওটাতে একটা গারমেন্টস এর দোকান হল, তখন জানলাম ঠুক্রাল বেশ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। হাই সুগার থেকে অন্যান্য কম্পলিকেশন। খুব খারাপ লাগল ঘটনাটা শুনে।

দুই আঙুলের নখ দিয়ে চেষ্টাচরিত্র করে, ডাটিটাকে টাইট করি, আবার দুদিন পরে যে কে সেই। সব জায়গায় সাবধানে থাকতে হয়, চশমা না খুলে পড়ে যায়। বাড়িতে বেশ কয়েকবার নীচু হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে মেঝেতে। কিছুদিন আগে আরেক কান্ড। মাছের বাজারে গিয়েছি। মাছওয়ালা বলল, ভালো শিঙ্গি মাছ আছে। জলরাখা ড্রামে অনেক জ্যান্ত শিঙ্গি ও কই মাছ। সাইজগুলো বোঝার জন্য যেই একটু ঝুঁকেছি, চশমা খুলে সোজা মাছভর্তি জলে। আশেপাশের দুই একজন গেল গেল বলে উঠলেন। ততক্ষণে অঘটন ঘটে গিয়েছে। মাছওয়ালার ছেলে চশমা উদ্ধার করে দিল। পরিষ্কার করে দেখলাম সব ঠিকই আছে, খালি একটা মাছ মাছ গন্ধ চশমাতে। তা যাকগে, মাছের গন্ধ ভালোই লাগে, চশমাটাতো ইনট্যাক্ট আছে। দেখা যাচ্ছে, চশমার জান পুরো কই মাছের জানের মতো।

আরেকটা নবলন্ধ উপলব্ধি হল। কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর, চশমা ভালো মতোই সেটে আছে নাকের ডগায়। প্রবলেম শুরু হয় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে ভাবলাম, ভোরে বেশী ঠান্ডা থাকে, তাই চশমা শ্রিংক করে যায়, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা এক্সপ্যান্ড করে। দৈর্ঘ্যপ্রসারণ গুনাঙ্ক, রেল লাইনের এক্সপানসান, এসব স্কুলে থাকতেই পড়েছিলাম। সহজ বিজ্ঞানের ফান্ডা। বৌকে বললাম আমার রহস্যভেদের কথা। সুমিতাও সাইন্স স্টুডেন্ট, সে আমার থিয়োরিতে ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল - দূর, কাচের আবার এক্সপানসান, কনট্রাকশন হয় নাকি। এই যা, আমি দেখছি সব ভুলে মেরে দিয়েছি। পরে দুজনে মিলে কনক্লুশনে এলাম, সকালবেলায় ঘুমের পর মুখটা ফুলে থাকে, তাই চশমাটা ঠিকঠাক বসে।

নতুন চশমা না কিনলেই নয়। আজকাল খুব এ্যড দেখি লেন্সকার্ট ডট কমের। এ্যডভান্স টেকনোলজিতে তৈরি হবে চশমা। এ্যাপস আছে। মোবাইলে ডাউনলোড করে, দেখি হাইটেক ব্যাপার। ঘরে বসেই মোবাইল ক্যামেরাতে ছবি তুলে, বিভিন্ন ফ্রেমে, নিজের মুখ কেমন দেখাচ্ছে জানা যাবে। তবে চোখের পাওয়ার জানার জন্য, হাইটেক হাত খাড়া করে দিয়েছে। একশ টাকা দিলে, তারা বাড়ি এসে চোখ টেস্ট করে দেবে। পরের দিন থেকে ফোনাঘাত। এসটিডি কোড দেখে বুঝলাম কোনোটা ব্যাঙ্গলুরু, কোনোটা

হায়দ্রাবাদ বা কলকাতা থেকে আসছে। তাদের বক্তব্য, আমি নাকি অলরেডি এপয়ন্টমেন্ট করে ফেলেছি ওদের নিয়ারেস্ট স্টোর, ইন্দিরাপুরমে যাওয়ার জন্য। একেই বলে এগ্রেসিভ মার্কেটিং স্কিল। তবে বেশি চাপাচাপি করলে যে কাস্টমারের সন্দেহ হয় ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়’ সেটা বোধকরি লেন্সকার্টের সিলেবাসে ছিল না। দু তিন দিন ধরে যত ফোন এল সবগুলোকে ব্লক করে দিলাম।

তবে ভবী ভোলার নয়। কয়েকদিন আগে মেঘলা মিস্টিক ওয়েদারে বেরিয়েছিলাম ঘুরতে। ইন্দিরাপুরমের হ্যাবিটট মলে গিয়ে দেখি সেই লেন্সকার্টের দোকান। হাতে অঢেল সময়। তাই ঢুকে পড়লাম। চটপটে চেহারার স্মার্ট তরুণ তরুণী, লেন্সকার্ট লেখা টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করোনার বাজারে, বেশ ইলাবরেট সিস্টেম। যে ফ্রেম ট্রাই করছি, সেটা রিজেক্ট করলে একটা সাদা ট্রেতে রাখতে হবে, যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা কালো ট্রেতে। দেখা শেষ হলে রিজেক্টেড চশমা স্যানিটাইজ হয়ে চলে যাবে আবার শোকেসে। বেশ ফ্ল্যাচার্টের মতো ব্যাপার। সাদাটাতে লেখা-উই আর গোয়িং ফর স্যানিটাইজেশন, কালোটাতে কিছু লেখা নেই। স্টোরের ম্যানেজারকে ডেকে বললাম, কালোটাতে লেখ - ‘ওয়েটিং ফর ইওর ফাইনাল কল’। আমার কাছে এরকম ম্যানেজমেন্ট ফান্ডা পেয়ে সে খুব খুশী।

সেলসম্যান জানাল, এখন লোভনীয় অফার চলছে- ‘বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রী, সঙ্গে একবছরের গোল্ড মেম্বারশিপ। একবছরের মধ্যে চশমা বানালে ওয়ান প্লাস ওয়ান ফ্রি অফার পাওয়া যাবে। লোভনীয়, সন্দেহ নেই। ভালোই হল, চশমা তো লাগবেই। অফারটাই কাজে লাগান যাক। দুজনের দুটো ফ্রেম পছন্দ করলাম। এরপর চোখের পাওয়ার পরীক্ষা হল। ইয়াং ছেলেটিকে বেশ সিনসিয়ার লাগল। খালি মেশিনে চোখ লাগিয়েই নয়, ট্রাডিশনাল মেথডে কাঁচের পর কাঁচ লাগিয়ে পাওয়ার চেক হল। ডবল চেকিং। আমি ইমপ্রেসড ও কনভিন্সড। দুজনে বাইরে বেরিয়ে বলাবলি করলাম - ‘বেশ সময় নিয়ে চোখ টেস্ট করছে। পেমেন্টও হয়ে গেল ৮৭০০/- চশমার দাম।

কালকে এসএমএস পেয়ে সাধের চশমা ডেলিভারি নিয়ে এলাম। দুজনের জন্য দুটো কেস। একটা বড়সড় রেকট্যাঙ্গুলার, অন্যটা একটু ওভাল শেপের। ম্যানেজমেন্টের তারিফ করতে হল, যাতে গুলিয়ে না যায় তাই দুরকম কেস। বিকালে নতুন চশমা পরে হাঁটতে গেলাম। কিরকম যেন লাগছে। বাঁদিকের উপরটা কেমন আবছা। মোবাইল খুলে হোয়াটস্ অ্যাপ দেখতে গিয়ে দেখি মোবাইলটা কেমন

ডিশেপড দেখাচ্ছে। মোবাইল স্ক্রীনটাও কেমন জানি ফ্ল্যাট নয়, মাঝখানটাতে ওভালশেপ হয়ে গিয়েছে। মহা মুশকিল। বাড়ি এসে বললাম, খোঁকা খেলাম মনে হচ্ছে, পাড়ার চশমার দোকানই ভালো, হাইটেকে গিয়ে যত বিপত্তি। কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে দেখি সকাল নটা থেকে রাত নটা অব্দি সার্ভিস। এখন বন্ধ। আমি দমে যাবার পাত্র নই। হোয়াটস্ এপে চ্যাট করা যায়। বিলের কপি, চশমার ছবি সব পাঠিয়ে কমপ্লেন করলাম। অন্যপাশ থেকে অনেক দুঃখ প্রকাশ করে জানাল যে এখন কিছু করা যাবে না, কালকে সকাল নটায় চ্যাট অথবা ফোন করতে হবে। পরের দিন আর কিছুতে ভরসা না করে সোজা দোকানে হাজির হলাম। বেশ চেষ্টামেঁচি করে বললাম, এতক্ষণ ধরে চেক করে এটা কি বানিয়েছ। সেন্টারিং পর্যন্ত করতে পারনি।

সেলসের লোকটা বেশ অবাক। চশমার এরকম গড়বড় বোধহয় সচরাচর হয় না। চশমাটা নিয়ে ছেলেটা ভিতরে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলল, স্যার ইয়ে আপকা নেহি, ম্যামকা চশমা হয়। এ্যা, কি বিপত্তি, এরকম একটা ভুল যে হতে পারে সেটা মাথাতেই আসেনি। পুরো দোষটা যে আমাদের তাও ঠিক নয়। যে খাপ দুটোর মধ্যে দিয়েছিল সেটা একটা ওভাল শেপের। দেখলেই মনে হয় ওটা মেয়েদের। আমি ধরেই নিয়েছি, ওটাতে সুমিতার চশমা আছে। আমি অন্য কেসটা থেকে চশমা বার করে পরেছি। সুমিতা পরতেই ঠিকঠাক ফিট করে গেল। যাক রহস্যের যবনিকাপাত হল। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। তবে মনে হচ্ছিল, সেলসম্যান গুলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।



বার্ষিক পিকনিক ২০২৬

অদ্ভুতুড়ে

প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
(CE 1964)

জীবনের ৮০-টা বছর পার করে পিছন ফিরে তাকালে অনেক কথাই মনে পড়ে যায়, তার কিছু কিছু সুখকর স্মৃতি হলেও কিছু স্মৃতি আবার অতটা সুন্দর নয়, আবার কিছু স্মৃতি আছে যা আমার কাছে আজও রহস্যময় রয়ে গেছে।

আমার চাকরি জীবনের মধ্যভাগে যখন আমি সরকারী চাকরি ছেড়ে private sector-এ যোগদান করতে চলেছি ঠিক তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনে যা আমাকে অনেক দিন পরে আজও ভাবায়। আমি আজও বুঝতে পারি না যে কিভাবে আমার মতো একজন বিজ্ঞানমনা মানুষকে নিয়ে এরকম একটা ভুতুড়ে ঘটনা ঘটতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে কিছু পশ্চাৎপট এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপস্থাপনা করা দরকার।

তখন সম্ভবত ১৯৮৭ বা ১৯৮৮ সাল। আমি Central Water Commission-এ Director-এর চাকরি করি। দিল্লির রামকৃষ্ণপুরমে সেবা ভবনে আমার অফিস। এর ঠিক আগে আগেই আমি Shillong-এ North Eastern Investigation Circle-এ posted ছিলাম Superintending Engineer-এর পদে। কিছু দিন পূর্বেই আমি দিল্লিতে বদলি হয়ে এসেছি। এর ঠিক পরেই মধ্যপ্রদেশ সরকার থেকে আমার বসের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ করা হয় যে আমি যদি ওই রাজ্যের একটি proposed medium hydro power generation project-এর অনুসন্ধান কাজে সাহায্য করি তাহলে ওরা খুবই উপকৃত হবেন। ওরা জানতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের কাজে আমার কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা

রয়েছে, তাই ওরা আমার সাহায্য চাইছেন। ওরা স্বাভাবিক ভাবে study করে বুঝেছেন যে প্রকল্পটি যথেষ্ট viable এবং সর্বোপরি এটা রাজধানী রায়পুরের খুব কাছেই তাই মধ্যপ্রদেশ সরকার এই প্রকল্পের রূপায়ণে খুবই আগ্রহী।

এখানে বলা দরকার যে এই ধরনের প্রকল্প রূপায়নের জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র সরকারের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে হলে CWC-এর থেকে project approval পাওয়ার প্রয়োজন। এটা একটা mandatory requirement। তাই ওরা যদি প্রকল্পের investigation stage - এই আমার মতো একজন CWC expert-এর সাহায্য পায় তাহলে পরবর্তী সময়ে এই প্রকল্পের রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেতে ওদের সুবিধা হবে।

যেহেতু এই প্রকল্পের সহায়তা করা আমার কাজের আওতায় পড়ে না এবং পুরোটাই unofficial, তাই আমার বস আমার মতামত চাইলেন। আমার কাছে এটা একটা বিশেষ সম্মানের বিষয় তাই আমি রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক হলো পরবর্তী শুক্রবার আমি evening flight-এ রায়পুর যাব, শনিবার site inspection করে রবিবার সকালে Chief Engineer এবং তার টিমের সাথে আলাপ আলোচনা করে বিকালের flight-এ দিল্লি ফিরে আসব। তারপর দিল্লি থেকে আমার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেব।

যথাসময়ে আমি রায়পুরে সরকারি গেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম শুক্রবার রাতে। পরদিন Executive Engineer যিনি এই প্রকল্পের কাজে আছেন এবং তাঁর একজন সহকারী Engineer সকাল সকাল আমার গেস্ট হাউসে হাজির হয়ে



গেলেন আর ব্রেক ফাস্টের পরে পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাইটের উদ্দেশ্যে।

আমার সঙ্গে যে দুজন অফিসার ছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। Executive Engineer বা সংক্ষেপে XEN-এর নাম শিবরাজ গুপ্তা, বয়স মধ্য পঞ্চাশের থেকে কিছুটা বেশি। সম্ভবত দু এক বছরের মধ্যেই রিটায়ার করবেন। দ্বিতীয় জন, AEN, নাম অমিতেশ, এরও পদবী গুপ্তা। খুবই সুদর্শন এবং দৃশ্যত খুবই চালাক চতুর। পরে শুনেছি এরা দুজনে মামাত পিসতুতো ভাই, একই Department-এ চাকরি করে। সে কথায় আরও বিস্তারিত ভাবে পরে আসছি।

গাড়িতে যেতে যেতে প্রকল্পটা সম্পর্কে নানা রকম আলোচনা চলতে থাকল। এই ধরনের প্রকল্পে water availability study অন্তত গুরুত্বপূর্ণ। AEN অমিতেশ নিজেই hydrological studies করেছে বলে জানাল। বস্তুতঃ project-এর hydrological studies-এর জন্য CWC-র detailed guidelines আছে যা অনুসরণ করলে আর বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন হয় না। তবে সবাই যে সঠিক ভাবে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল তা নয়। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। hydrological report-টা পড়ে আমার মনে হলো যে সাধারণ ভাবে রিপোর্টটা ঠিকই আছে। যেহেতু এটা একটা run-of-the river scheme তাই hydrological assessment খুব জটিল নয়। অমিতেশ যা করেছে সেটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

নদীর জল divert করার জন্য un-gated weir suggest করা হয়েছে যা আমি এক্ষেত্রে সঠিক বলেই মনে করি। প্রকল্পটির অন্যান্য components যেমন collection well, head race channel, fore-bay, penstock, power house, tail race channel, tail inlet ইত্যাদি খুবই যত্ন সহকারে স্থাপন করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব সঠিক ভাবেই planning করা হয়েছে। পথ চলতে চলতে আনুমানিক দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমি প্রকল্পটি সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল হয়ে নিলাম। সেই সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে নিলাম আমি কোন কোন জায়গায় inspection-এর সময় বিশেষ গুরুত্ব দেব।

এতটা লেখার পর আমার মনে হলো একটু থামা দরকার। আমার স্থির বিশ্বাস সবাই না হলেও বেশিরভাগ পাঠক-পাঠিকারা মনে মনে আমাকে খুব বকাবকি করছেন যে আমি কি ওদেরকে নিজের junior colleagues ভাবছি? Design of small hydroelectric projects-এর ওপর

lecture দিয়ে যাচ্ছি? Absolutely disgusting!! বিশ্বাস করুন সে রকম কোনো অভিপ্রায় আমার আদৌ নেই। আমি শুধু চেয়ে ছিলাম আপনাদেরকে এই প্রকল্পের ব্যাপারে এবং আমার চিন্তাধারার সাথে একইসঙ্গে যুক্ত করতে যাতে করে আমি আপনাদেরকে আমার মতো করে তৈরি করে নিতে পারি।

এবার এখান থেকে আমি আপনাদের একটু সময়ের জন্য অন্য পথে নিয়ে যেতে চাই।

গল্পের এইখানে আমি একটা নতুন চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যার নাম রোহিণী। না, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রোহিণী নয়। ইনি একজন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী আধুনিক নারী যিনি বিংশশতাব্দীর টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন এবং আরও বড় হওয়ার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যার জীবন দর্শন হচ্ছে ভালোভাবে বেঁচে থাকা, সম্ভব হলে আরও ভালোভাবে আরও ভালোভাবে। রোহিণী বঙ্গ তনয়া, পিতা শান্তশীল বিশ্বাস, মা মল্লিকা দেবী। এনারা ওপার বাংলা থেকে এসে রায়পুরের কাছাকাছি বসবাস শুরু করেন যাটের দশকের মাঝামাঝি। বর্তমানে বিশ্বাস মশাই রায়পুর হাইকোর্টের আইনজীবী আর মল্লিকা দেবী গৃহবধূ। রোহিণী ওদের একমাত্র সন্তান। রোহিণীকে চলতি ভাষায় চটক সুন্দরী বলা যায়। গায়ের রঙ একটু চাপা কিন্তু চোখ আর মুখের গড়নের একটা আলাদা সুন্দরতা আছে যা তাকে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। পড়াশোনায় খুব ভালো না হলেও রায়পুরের একটি কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে। ভাগ্য খুবই প্রসন্ন থাকায় পাস করার সাথে সাথেই সরকারি চাকরি পেয়ে গেছে এবং স্টেট ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, Executive Engineer শিবরাজ গুপ্তার আভারে, ১৯৮৫-এর মে মাসে।

গুপ্তাজীর তার কয়েক বছর পূর্বে পত্নী বিয়োগ ঘটেছে। সন্তান সন্ততি কিছু হয়নি। সব সময়ে কেমন যেন একটা শূণ্যতা বোধ করেন। রোহিণীর মতো একজন শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মহিলা এমতাবস্থায় গুপ্তাজীর জীবনে প্রবেশ করে ফেলল অনেকটা উষ্কার গতিতে, যদিও দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল বিস্তর। গুপ্তার জীবন যেন এই রকম একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিল আর রোহিণীও এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বোধহয় একেই বলে ভবিতব্য।

আমার কাহিনিতে আরও একটি চরিত্র আছে, অমিতেশ



গুপ্তা। এর নাম আপনারা আগেই শুনেছেন তবে এর সম্যক পরিচয় এখনো দেওয়া হয়নি। অমিতেশ, সংক্ষেপে অমিত, একজন অতি মেধাবী ছাত্র ছিল। রায়পুরের এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়েছে ফাস্ট ক্লাস পেয়ে, তিন বছর আগে। পরের বছর স্টেট সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে এবং পিসতুতো দাদা শিবরাজের ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েছে। অমিতেশকে তাই সবাই একটু বাড়তি সমীহ করে চলে, একটু বেশি সম্মান দেখায়।

এদিকে বাড়ির ভিতরে বৌদি দেবরের খুনসুটি বেশ ভালোই চলে। শিবরাজকে প্রায়ই রায়পুরের বাইরে যেতে হয় অফিসের কাজে, বিভিন্ন সাবঅডিনেট অফিস ইনস্পেকসনে। এই সমস্ত সময়ে দেবরের আসা যাওয়া অনেকটাই বেড়ে যায়। খুনসুটি আর ঠিক খুনসুটি থাকে না। দুটি যুবক যুবতীকে পাশাপাশি ছেড়ে দিলে যে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছে। আচিরেই দুজনে দুজনের প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমি এসেছিলাম সাইট ইন্সপেকশনে, যেখানে শিবরাজ এবং অমিতেশ দুজনেই আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছু ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে যদিও আমার এদের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না। পাঠককে আমি আগাম সতর্কতা জানাচ্ছি। দয়া করে আপনারা ধামাকার জন্য তৈরি থাকুন। Please tighten your seat belt।

আসুন আমরা এখান থেকে আমাদের গল্পের ফেলে আসা জায়গায় ফিরে যাই।

আমরা প্রথমেই diversion weir-এর proposed location-এ গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদের সাথে flask-এ চা ছিল, সবাই চা খেলাম। তারপর weir site ভালো ভাবে inspect করে, মোটামুটি axis-টা marker দিয়ে mark-করে, পরবর্তী কাজকর্ম কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলাম। ঠিক করলাম, যেহেতু Weir site এবং fore-bay site একই level-এ, XEN Shivraj Gupta আর অমিতেশ fore-bay site-টা ও mark করবেন আর আমি এবং দ্বিতীয় AEN, যার নাম কমলনয়ন, আমরা দুজন এবং কয়েকজন Junior Engineer Power House complex with tail race channel and tail Inlet-এর locations এবং alignment fix করব এবং mark করব। এই ভাবে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে আমরা

কাজটা শেষ করতে পারব অল্প সময়ের মধ্যে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাজ চলার পর আমরা দেখলাম fore-bay site-এর কাছে দাঁড়িয়ে শিবরাজ কিছু একটা বলতে চাইছেন আমাদেরকে, পাশে অমিতেশ দাঁড়িয়ে। বুঝলাম উনি penstock-এর alignment দেখাতে চাইছেন। Penstock হচ্ছে সেই লোহার পাইপ যার মধ্যে দিয়ে fore-bay থেকে জল ঢুকে turbine-এ গিয়ে strike করবে আর এর ফলে hydro power generated হবে। এই component-এর গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

ওনারা যে যায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, পাহাড়ের ঢাল ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে। ওই জায়গাটায় অনেক ঝাউগাছ আছে আর এই সময় ঝাউ পাতা ঝরে ঝরে পড়েছে। এই ঝাউ পাতাগুলো অত্যন্ত পিচ্ছিল, যার উপর পা পড়লেই পা পিচ্ছিলে যায়, যার ফলে জায়গাটা সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে। খুব সতর্ক না হলে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর একবার কেউ যদি পিচ্ছিলে পড়ে তাহলে তাকে বাঁচাতে পারা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে তিন শত ফুট পাহাড়ি ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের নিচে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না।

আমার সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল, কমলনয়ন, ইশারায় এবং চিৎকার করে ওদেরকে সাবধান করছিল বারংবার আর ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সেই দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল আমাদের চোখের সামনে। শিবরাজ বাবু পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছেন আর চারপাশে সবাই ভয়ে চিৎকার করছে সামহালকে সাব সামহালকে। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। যা ঘটর তা ঘটে গেছে আর শিবরাজ আছড়ে পড়লেন একটা বড় পাথরের ওপর। আমরা সবাই সেই দিকে দৌড়ে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। শিবরাজ শুধু একবার হাত তুলে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন এবং তার পর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। এত ভয়ানক একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি।

সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। যথারীতি পরদিন আমি দিল্লি ফেরত এলাম আর একটা detailed technical report পাঠিয়ে দিলাম Chief Engineer-কে। পরবর্তী কালে শুনেছিলাম এই প্রকল্পের রূপায়ন হয়েছে এবং state government আমার সাহায্যের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। আমি নিজেও খুব খুশিই হয়েছিলাম।

এই ঘটনাটি ঘটর বছর তিনেক পরের কথা। আমি সরকারি চাকরি থেকে voluntary retirement নিয়েছি আর



দিল্লিতেই একটা consultancy firm-এ join করেছি। আমার allotted আর কে পুরমের সরকারি বাসভবন ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন আমরা আমার সহধর্মিণী দিপালীর allotted সরকারি বাসভবনে থাকি, নেতাজি নগরে। আমাদের মেয়ে ও ছেলে স্কুলের গণ্ডি পার হতে চলেছে। বেশ শান্তিতেই কাটছে আমাদের দিনগুলো।

এই সময় আমাদের একটা অভ্যাস ছিল, আমি আর দিপালী রাতের খাওয়া-দাওয়া করার পর বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে CPতে Narula'sএ যেতাম আইসক্রিম খেতে কখনও কখনও। সেদিন ছিল শনিবার। আমরা ঠিক করলাম আজ আইসক্রিম খেতে যাব। যথারীতি আমরা CPতে Narula's এর নীচের তলায় একটা দুজনার টেবিলে বসেছি দুটো আইসক্রিম cone নিয়ে। তখনই দেখলাম আমার সেই পূর্ব পরিচিত অমিতেশ ঢুকল একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। দুজনে একটু দূরে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। মেয়েটি বসে রইল আর অমিতেশ কাউন্টার-এ গেল পয়সা মিটিয়ে আইসক্রিম কিনে আনার জন্য। অমিতেশ আমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ দেখলাম শিবরাজ গুপ্তার মতো দেখতে একজন লোক হনহনিয়ে ঢুকে সোজা চলে গেল অমিতেশের বাস্কবীর দিকে। তারপর ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। মেয়েটি টেবিলের উপরে লুটিয়ে পড়ল নিজের গলায় হাত রেখে। লোকটি অর্থাৎ শিবরাজ গুপ্তা যেমন হনহনিয়ে ঢুকে ছিল ঠিক তেমনই হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। আমি থ-হয়ে সবটা দেখলাম আর ভাবতে লাগলাম শিবরাজ তো তিন বছর আগে মারা গেছে তাহলে আমি যাকে দেখলাম সে কে? তবে কি এটা আমার চোখের ভুল! আর ঐ মেয়েটি? ও কি রোহিণী? চট করে আমার মাথায় একটা চিন্তা ধাক্কা মারল। আমি সময় নষ্ট না করে দিপালী-কে সাথে

নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার মনে হলো না দিপালী কিছু দেখেছে বা বুঝতে পেরেছে। আমার অবস্থা দেখে দিপালী নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল। সারা রাত্তা কোনো কথা বলতে পারলাম না।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখলাম এটা একটা হেডলাইন নিউজ। Mysterious death of a woman at the Narula's। ওদের খবরে জানা যাচ্ছে যে মহিলাটির নাম রোহিণী। তার মানে বোঝা যাচ্ছে অমিতেশ রোহিণীকে বিয়ে করেছে শিবরাজের মৃত্যুর পর। খবরের সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে জানা গেছে যে মহিলার গলায় যে দুটি আঙুলের দাগ মিলেছে তা হল ওই মহিলার নিজেরই। অর্থাৎ মহিলা নিজেই নিজের গলা চেপে ধরেছেন নিজের আঙুল দিয়ে এবং এতটাই জোরে চেপে ধরেছিলেন যে তা থেকে তিনি নিজের মৃত্যুর কারণ হলেন। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি শিবরাজকে ওর গলা চেপে ধরতে, অথচ আমি জানি শিবরাজ তিন বছর আগে মারা গিয়েছে। আমার চোখের সামনেই মারা গিয়েছে। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে লাগছে, তাই না? তবে কি শিবরাজের অশরীরী আত্মা এইসব করেছে! এও কি বিশ্বাস্য! তবে একটা কথা আমার কাছে এখন স্পষ্ট। সেদিন site inspection-এর সময় ঘটে যাওয়া শিবরাজের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনার কারণে ঘটেনি, ওকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল আর সেই কাজটা করেছিল অমিতেশ, আর কেউ নয়। মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই হাত উঠিয়ে শিবরাজ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন। আমরা তখন বুঝতে পারিনি। শিবরাজের অতৃপ্ত আত্মা মৃত্যুর পর অমিতেশ আর রোহিণীর কাছে কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং সুযোগ পেতেই প্রতিশোধ নিল।

পাঠক পাঠিকারা এবার আমার ছুটি। আর কিছু যদি ভাবতে হয় তাহলে আপনারা ভেবে নিন।

বিকেলের চা

ঋত্বিক সেনগুপ্ত

(Arch ১৯৯৩)

ব্রজ কিশোর মিশ্র, চাকরির অবসরের চার বছর আগে দিল্লিতে এসেছিলেন। পদোন্নতি ও বদলি হেতু - বেঙ্গলের স্টেট cadre-এ তার আগে ২২ বছর কলকাতা থেকেছেন। খানিকটা ইচ্ছাকৃত, যাতে ছেলের স্কুল কলেজের পাট-চুকানো পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন না ঘটে। সেন্ট লরেন্স, প্রেসিডেন্সির পাঠ শেষ করে পুত্র রাজেশ যখন মার্কিন মুলুকে, ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে, স্নাতোকোত্তর স্তরের ছাত্র, তখন প্রোমোশন ও বদলি সুগ্রাহ্য করে, দিল্লিতে Ministry of Home Affairs-এর উচ্চপদে যোগদান করলেন ব্রজ কিশোর। বছর আট হল।

কলকাতায় দীর্ঘ ২৩ বছর বসবাস করে, দিল্লির পশ্চিম-বিহারের বাঙালি-পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার যৌথ-পছন্দ ও খানিকটা পক্ষপাত ছিল, ব্রজ কিশোর ও তাঁর স্ত্রী, আরাধনা দেবীর। কলকাতার জীবন-যাপন, বাঙালিদের বাজার-দোকান, আদব কায়দা, ভেসে আসা রান্নার গন্ধ ও বারান্দার রেলিং ধরে ছুটির-দিন-বিকেলের আড্ডা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের গতের বাঁধন-সম। সেই সুত্রে, পয়লা বৈশাখ ও বিজয়া দশমীর দিন ফোনে ছেলে রাজেশকে আশীর্বাদ করার রীতি-রপ্ত হয়েছেন এই দম্পতি। দিল্লির পিনকোড 110063 অন্তর্গত, ব্যাঙ্ক কলোনিতে এঁরা সুপরিচিত ও বাঙালি-বৃত্তে বন্ধুজন-বেষ্টিত। এমনকি, অনেক অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি পতির মতন, গত দেড়-বছর, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালানোর কাজটাও ব্রজ কিশোর করে আসছেন।

এছাড়া, বিকেলবেলা, বারান্দার বেতের টেবিলে দু'কাপ

চা রেখে, ঘর থেকে প্লাস্টিকের চেয়ার-দুটো এনে বসে সাম্যকালীন আয়েশের সূচনা, এটা একরকম কর্তব্য-প্রায়। এই অভ্যাস অবশ্য চাকরি-জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্তির পর।

পাশের বাড়িটা, builder flat হবার পরে, তিনতলায় এক বাঙালি নব-দম্পতি ভাড়াটে এসেছে। বাড়ির সদর গেটে তাদের নাম লেখা আছে সুমিত ও সুমনা। বারান্দায় বসে চায় চুমুক দিতে-দিতে, ব্রজবাবু বারবার আর চোখে খেয়াল করেছেন, সুমনা ও সুমিত, ওনার চা-খাওয়াতে দৃষ্টিপাত করে আজ তেমন বোধ হওয়াতে, ব্রজবাবু সরাসরি জিগেস করলেন, ‘কিছু বলবেন?’

ইতস্তত সুমনা বলল, ‘হ্যাঁ, মানে আপনারা বাঙালি?’

‘ছিলাম না, হয়ে গেছি’ বলে মুচকি হাসলেন, ব্রজবাবু। উত্তরে, ‘আজ তো শনিবার, আমরা কি একটু গল্প করতে আসতে পারি?’ বলে সাড়া দেয় সুমিত।

‘চলে আসুন’, সম্মতি দেন ব্রজবাবু।

প্রায় আধঘন্টা পেরিয়ে, উপস্থিত হল, সুমনা-সুমিত।

খানিকটা বার্তালাপ শুরু করবার দায়, সুমনা বলল, ‘আপনাদের বয়সে বাড়ি-ঘর-দোর এত সাজানো খুব একটা চোখে পড়েনা।’

‘না বোধহয়, আমাদের বয়সেই মনে হয় ঘর গুছিয়ে থাকা সহজ, আমার ৬৪ বছর পার হল।’

‘আর কাকিমা কোথায়?’ সুমনার প্রশ্ন।

‘আগে বল চা না কফি?’

‘আগে একটু আলাপ সেরে নেই কাকু, তারপর।’

3 seater-টায় মাঝে একটু জায়গা ছেড়ে বসল সুমনা-



সুমিত, আড়াআড়ি ২ seater-এর কোণা ঘেঁসে ব্রজবাবু। বসামাত্র, একগাল হেসে সুমনা বলল, ‘আপনি এই যে রোজ বিকেলে - মানে আমরা অবশ্য উইকেন্ডেই খেয়াল করি - আপনি এই যে আপনার আর কাকিমার চা বানিয়ে বারান্দায় এনে বসেন, আমরা খুব তারিফ করি।’ ‘আমাদের দু’জনেরই খুব ভালো লেগেছে, কাকু! কাকিমা খুব লাকি।’

‘আমারও ভালো লাগে বলে করি, কেউ তো জোরাজুরি করে না। বছর দুই হল, এইরকম একটা সন্ধ্যায় এক রবিবারে, আমরা চা খেয়ে ঘরে ঢুকে টিভিটা সবে খুলেছি, আমার স্ত্রী ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিতে গিয়ে আমায় ডেকে বললেন, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, ঠাকুরকে ধূপটা দিয়ে দাও বলে বসে পড়েছিল মাটিতে। সেই বোধহয় প্রথম আমি ঠাকুরঘরে ধূপ জ্বালালাম - তবে আমি নাস্তিক নই। এরমধ্যেই অচেতন। তোমাদের নীচে থাকেন দাশ-বাবু, তাঁর সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, ডায়াগনোসিস হল ট্রানসিয়েন্ট ইস্কেমিক আটাক, তার থেকে দুদিন পর সেরিব্র্যাল। ১০ দিন পরে আমার স্ত্রী আরাধনা বাড়ি ফিরলেন, কোমরের নীচে প্যারালিসিস নিয়ে। ভেতরের ঘরে শুয়ে থাকত, নার্স দেখাশুনা করত দিনে ১০ ঘণ্টা।

তবে এই বিকেলের সময়টা, ওর আদেশ মেনে, আমি বারান্দায় বসে চা খাওয়া শুরু করলাম। হুইলচেয়ারে এসে পাশে বসত - দু-তিনবার বলেছিল, এই বিকেলের চায়ের আলগা আড্ডা নাকি ওর বড় ভালো লাগত। এটাই নাকি আমাদের দুজনকে চাঙ্গা রেখেছে। বলত এখন তো আর একসাথে বেড়াতে যাওয়া হয় না। এই বিকেলের নিরাল্লা আড্ডাতেই আমরা ঘুরে বেড়াব। একবছর আগে, থার্ড অ্যাটাকে দেহ ছাড়ল। আমি যদি দুইকাপ চা নিয়ে না বসি, তাহলে তো ওর সাথে আড্ডার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়না!... ওঁর সঙ্গ পাওয়ার আনুসঙ্গিক ওই চায়ের টেবিল আর দু’কাপ চা। আমরা একান্তে আড্ডা মারি! অনেক কথা।’

সুমনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কাকু, কফিটা আমি করি, একটু বলে দিন।’ তারপরে বিষয়-বদল করতে বলে উঠল, ‘আপনার বাড়িতে যেখানে ঠাকুরঘর, আমাদের বাড়িতে স্টোর-রুম।’

ব্রজবাবু বললেন, ‘আমারও তেমনি, আমি এখন ওই ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিতে বসলে ওটা আমার স্মৃতির স্টোর-রুম হয়ে ওঠে; তাই সন্ধ্যা দিতে বসি - আমি আন্তিক ও নয়।’



মরীচিকা

সুমিত রায়

(ET ১৯৯২)

‘ওই ঝিনুক উড়ে গেল।’

অভি আর খুশি তাকিয়ে ছিল এয়ারপোর্টের দিকেই। প্লেনটার টেক-অফের সময় পেরিয়ে গেছিল। এয়ারপোর্টটা কলেজের থেকে বেশি দূরে নয়। ঝিনুককে সী-অফ করে অটোতেই ফিরে এসেছে ওরা। আজকাল ভেতরে তো আর ঢুকতে দেয় না। যদি দিত! হয়তো ঝিনুক আরেকবার মুখ ঘুরিয়ে বাই করত!

অভি চেষ্টার শেষ রাখেনি। সী-অফের শেষ কয়েকটা কথা যেন গলায় আটকে না যায়, চোখ দুটোতে ওর মনের ছবি ভেসে না ওঠে। ছেলেদের ইমোশনাল হতে নেই, জীবন তো আর বলিউড ফিল্ম নয়। খুশির চোখে সে যেন ধরা পড়ে না যায়।

কলেজের চারটে বছর কবে যে কেটে গেল! ছোট শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবা মায়ের ছায়ায় বড় হওয়া, তেমন বড় স্বপ্ন তো ছিল না। সবাই বলত, আমাদের অভি স্কুলের সেরা ছেলে, বিশ্ব জয় করবে। মা বলত, তোর জন্য আমার কি সম্মান রে অভি, সবাই বলে, দেখো, অভির মা।

মা অভির বড় দুর্বলতা। পড়াশুনা তেমন যে ভালো লাগত তা না - কিন্তু সবার আশার মান রাখতে রাখতে অভি হয়ে গেল ছোট শহরের বড় অভিমান। লড়াই করে জায়গা করে নিল বড় কলেজে, শহরের বাইরে, অনেক অনেক দূরে।

সেদিনটা বার বার মনে পড়ে অভির। প্রথম বার বাড়ির বাইরে হোস্টেলে গিয়ে থাকতে হবে। রেসিডেন্সিয়াল

কলেজ। রাতে শুয়ে শুয়ে কল্পনা করেছে - কেমন হবে সেটা। দু তিনটে অচেনা ছেলের সাথে এক ঘরে থাকা। মা নেই, বাবা নেই। পানুদার মুদির দোকান নেই, বক্সীদার কোচিং ক্লাস নেই। গোলু নেই, দিপু নেই, রবি নেই। মা উঠতে বসতে বলে যাচ্ছে, ‘এটা করিস, ওটা করিস না’ - লুকিয়ে চোখ মুছে। অভি আজকের মতোই অনেক চেষ্টা করেছিল গলাটা যাতে ধরা ধরা না শোনায়ে। চোখটা ছলছলে না লাগে। মা যখন কেঁদেই দিল তখন আর নিজেকে লুকোতে পারেনি।

কলেজের শুরুটা যে এমন লজ্জার হবে অভি স্বপ্নেও ভাবেনি। গুড বয় লুকের ছেলেরা নাকি বেশি ragging এর শিকার হয়। বিশেষত সেই দিনটা। অভি boys স্কুলে পড়ত। কলেজে এসে ক্লাসের মেয়েদের থেকে দূরে দূরেই থাকত, তেমন স্বাভাবিক হতে পারত না। সেদিন ক্লাসের একদল মেয়ে একসাথে আড্ডা মারছিল। সিনিয়ররা অভির হাতে একটা গোলাপ ফুল দিয়ে বলেছিল - ‘ওই মেয়েটাকে I love you বলে এই ফুলটা দিয়ে আয়।’

ওটাই ছিল ঝিনুক, মেয়েদের গ্রুপে সবথেকে চোখে পড়ার মতো। অভি যাবেই না, প্রায় কেঁদে দিয়েছিল। সিনিয়ররা বকে মেরে ওকে বাধ্য করেছিল। পা কাঁপতে কাঁপতে দুর্ধু বক্ষে গিয়ে ফুলটা দিয়েছিল ঝিনুককে - I love you আর বলতে পারেনি। মেয়েরা তো ওর অবস্থা দেখে হেসে কুটিপাটি। ঝিনুক খুব স্মার্ট, বলেছিল - ‘so cute - ওরা তোকে ragging করছে?’ হাত বাড়িয়ে অভির হাত ধরে বলেছিল - ‘you are my friend, my



boyfriend! আবাব সবাই হেসে কুটিপাটি। অভি লজ্জায় একদম সিঁটিয়ে গেছিল - কোনোদিন কোনো মেয়ের হাত ধরেনি। খুশি ওকে উদ্ধার করে বলেছিল - ‘ও খুব ভালো ছেলে, ওকে bore করিস না, ছেড়ে দে।’ দূরে সিনিয়র ছেলেরাও হেসে কুটিপাটি। অভির আত্মসম্মান মাটিতে মিশে গেছিল।

তারপর চার চারটে বছর যেন ঝড়ের মতো চলে গেল। গুড বয় cute অভি ধীরে ধীরে পড়াশুনায় ক্লাসের লাইফলাইন হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ মেয়েদের। অভি সিরিয়াস, ক্লাস বাংক করে না, সব টিচারের ফেব্রারিট, সব নোটস সব প্রব্লেমের সলিউশান ওর কাছেই থাকে। সবাই ওর থেকে কপি করে, ও বিনুককে কপি করে দেয়।

বিনুক ছিল ক্লাসের প্রাণ। ও বড় শহরের বড় স্কুলে ছোটবেলা থেকে co-ed এ পড়েছে। সাবলীল, সুন্দরী। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। যেমন লাইফ এনজয় করত তেমনই ছিল এম্বিশাস, ক্যারিয়ার মাইন্ডেড। খুশি ছিল ওর বেস্ট ফ্রেন্ড, সে ছিল খুব গ্রাউন্ডেড।

কলেজের প্রথম বছর। আর সব ছেলেদের মতো অভিরও বিনুকের প্রতি কেমন যেন একটা চাপা আকর্ষণ ভেতরে ভেতরে গাঢ় হচ্ছিল। কিন্তু অন্য ছেলেরা অনেক বেশি স্মার্ট, অভি তাদের পেরিয়ে আগে যেতে পারেনি। কিন্তু ক্লাসের নোটস নিতে, প্রব্লেম সলভ করতে, ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট করতে বিনুকই অভির পেছনে ঘুরত। সবাব সামনে ওর গাল টিপে বলত - ‘তুই কি cute, একদম অরিজিনাল, অরগানিক।’

সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ারে সেই মেলামেশা ঘন হয়ে উঠেছিল। ছেলেরা অভিকে ঈর্ষা করত - বিনুক কি ধীরে ধীরে অভির প্রেমে পড়ছে? বিনুক কিছু চাইলে অভি গলে যেত, ভেতরে ভেতরে ভাবত, সত্যি কি বিনুকের মনে ওর প্রতি বন্ধুত্বের বেশি কিছু আছে? তাই যদি হত!

ফাইনাল ইয়ার আসতে আসতে অভি, বিনুক আর খুশির এক ট্রায়ো তৈরি হয়ে গেছিল - সব কিছুতে ওরা তিনজন একসাথে থাকত। বিনুক সবাই মধ্যমনি - নাচে,

গানে, নাটক করতে। অভির দম বেরিয়ে যেত বিনুকের এসিস্টেন্ট হয়ে সবকিছুতে ওকে topper বানাতে। খুশি ছিল যেন অভির দিদি। অভি কে নিজের ফোকাস থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখে ও সাবধান করত। অভি ভাবত এটা কি ওর ঈর্ষা?

ফাইনাল ইয়ার শেষ হয়ে আসছে। অভির রেজাল্ট আর তেমন ভালো আসছে না। Topper হতে পারত, কিন্তু পিছে পড়ে গেছে। বাবা মা ও একটা চাকরি পেলেই খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু বিনুক? কলেজ পেরিয়েও ও কি অভির সাথেই নিজের জীবন জড়িয়ে ভাবছে? তাই যদি হত!

সেদিন বিনুক ভীষণ একসাইটেড, লাফাতে লাফাতে এসে বলল, ও একটা US ইউনিভার্সিটিতে MBA প্রোগ্রামে এডমিশান পেয়ে গেছে। ওটা Ivy লিগে, ওখান থেকে বেরোলে US-এর বেস্ট কোম্পানীর দারুণ মাইনে দিয়ে ওকে লুফে নেবে। ওর চোখ চক চক করছিল, মুখে ভবিষ্যতের অপার স্বপ্ন। বলল, ‘আমাকে কদিনের ভেতরেই ফ্লাই করতে হবে। ভিসা, টিকিট অনেক কাজ। আর আড্ডা দিতে আসতে পারবো না রে।’

বিনুক বিদেশ যাচ্ছে, কই আগে তো বলেনি। কলেজের পর কে কি করবে ভালো করে সে কথাই হয়নি। চাকরিই তো হবে, যে যেখানে পায়। অভি ভাবত, দুজনে এক শহরে পাবে কি? বিনুকের বাবা মা কি ওকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাড়া করবেন? বিনুক কি চায়?

অভির গলা চোক করছিল, চোখ দুটো হয়তো ছলছলে হয়েছিল। বলেছিল, ‘যাবার দিন কিন্তু নিশ্চই বলবি, see-off করতে যাব।’ বিনুক বলেছিল, ‘সে তো বটেই। আর হোয়াটসএপ তো আছেই।’

খুশি বলেছিল, ‘অভি, বিনুক স্রোতে ভাসে, কোথাও লেগে থাকে না। তুই আবেগে ভাসিস না, একটা ভালো চাকরি ধর। মাসীমা মেসোমশাইর তোর ওপর অনেক আশা, তোর পথ চেয়ে বসে আছেন।’

কলেজ শেষ! জীবনের একটা অধ্যায় শেষ। অভির মাকে মনে পড়ল - সবাই বলে, দ্যাখ অভির মা! আজ মাকে ফোন করতে হবে।

সত্যিই তো!!

গোপা বিশ্বাস

(IR ১৯৭৯)

আজকে তাতাই মায়ের সঙ্গে দুর্গাঠাকুর দেখতে যাবে। আজ সে তাই মনের খুশিতে আপন মনে বক বক করে চলেছে তার কোলের পুতুল ভালুর সাথে। ‘জানিস ভালু – আজকে আমি না বেরু যাচ্ছি – টাকুর দেভে – তুই কিন্তু এতুও দালাতন করবি না – আমার দাত দরে দরে তলবি – তোলে করে বেতি নিতে প্যাবোনা।’

সে বছর দিল্লিতে কাশ্মিরী গেটের দুর্গোৎসবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। দিল্লির বাঙালি সকলে তাই খুব উত্তেজিত। সেখানে কি ধরনের অনুষ্ঠান সূচি পালিত হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। কবিতা প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সমস্ত দিল্লি জুড়েই সবাই সাদরে আমন্ত্রিত। তার ওপর উপরি পাওনা হিসাবে চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের বিশেষ আলোকসজ্জা সবাইকে যেন তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।

ভীড় ঠেলে তাতাই তার মায়ের সাথে এগিয়ে চলেছে ভালুর সাথে গল্প করতে করতে। ইতিমধ্যে খুব সুন্দর লাল-হলদে-নীল সমন্বয়ে বেলুন কিনে তাতাই ভালুর গলায় বেঁধে দিয়েছে। ছটফটে তাতাইর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই এখন। তার কচি হাত কখন মাকে ছেড়ে দিয়েছে তার খেয়ালই নেই। সে একমনে ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাতাইর খেয়াল হল-মা কোথায়? ছোট তাতাইর মা-মা ডাক ভীড়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

এদিকে তাতাইর মা অনবরত ছোট তাতাইকে অনিদিষ্টভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোথায় আমার ছোট মেয়েটি? তাতাই – তা-তা-ই ...

নাঃ কোথাও নেই, এবার সে কি করবে...? কী জবাব দেবে...? বাড়ি কিভাবে ফিরবে...? এখন অগত্যা পূজাকমিটির স্বেচ্ছাসেবক বা পুলিশ বিভাগের সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আর একটা জিনিসের আশঙ্কার আবার মায়ের বুক কেঁপে উঠল। কোনো অজানা অপরিচিত হাত

তাতাই ধরে তাতাই সত্যিই চিরকালের মতো যদি হারিয়ে যায়? নাঃ আর কিছু মায়ের মন ভাবতে পারে না। দু’হাতে ভীড় ঠেলে ছোট তাতাইর মা এগিয়ে চলে – আজকে যেন কাঁদবারও সময় নেই। শুধু এক অজানা আশঙ্কাকে বুকের মাঝখানে চেপে ছুটে ছুটে মায়ের গলা ক্লান্ত হতে থাকে। এই মুহূর্তে কুকথা কেন মনে হচ্ছে? তাতাইর বয়স যদিও মাত্র তিন, কিন্তু ওকে তো কতবার বাড়ির ঠিকানা – মায়ের নাম – বাবার নাম – দাদামশাইর নাম শিখিয়েছি – তবে? সেগুলোর কি কোনোই মূল্য নেই? জগজ্জননী – এই আনন্দের দিনে কেন তাকে কাঁদাবেন। আরে – একী শুনছেন... হঠাৎ ভীড় ছাপিয়ে এ কিসের আওয়াজ তিনি শুনছেন। ঐতো ঐয়ে, অ্যালো – অ্যালো – অ্যালো – আমি তাতাই বিভ্রাত – মা বিভ্রাত – তুমি দেখানে আতো – এখানে তলে এত – এই তেজের সামনে... অ্যালো-অ্যালো আমার মায়ের নাম তিমতী নন্দা বিভ্রাত, আমার মা তারিয়ে দেছে।

এক মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত মায়ের হৃদয়ের ব্যথা এবং আনন্দ এক সাথে মায়ের চোখের জলের ধারা হয়ে ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ল। নাঃ মা জগজ্জননীর আশিস সবার ওপরে। এই দিন কখনই কাউকে দুঃখিত করবে না। আর মানুষের জীবনে কোনো শিক্ষা, কোনো প্রচেষ্টা বিফলে যায় না বোধ হয় – যদি তার মধ্যে অকপট সদিচ্ছা থাকে। পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধের পরেই কোনো বিজেতা এত আনন্দ অনুভব করে না।

গরবিনী মা ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায় স্টেজের তাতাইর কাছে, স্বেচ্ছাসেবক মহলও খুব তৃপ্ত – ছোট তাতাইকে তার মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরে। কিন্তু হঠাৎ মায়ের হাত ধরে খুদে তাতাই ‘মা’কে একটা ছোট প্রশ্ন না করে থাকতে পারেনি...

‘খোতরাও তারাতেই পারে – কিন্তু... এত্তবড় হয়ে মা কি করে তারিয়ে দেয়?!’

সত্যিই তো!!!



আমি আর ছায়া নই

সৌমিত্র ভট্টাচার্য

(গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ২০১১)

জীবনের এক প্রান্তে এসে নিমিষা আজ নিশ্চিতভাবে জানে-তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ‘ভালো মেয়ে’ হয়ে ওঠা। সেই ভালো মেয়েরা কখনো নিজের কথা আগে বলে না, নিজের স্বপ্নকে প্রশ্ন করে, নিজের ইচ্ছেকে লজ্জা শেখায়। দায়িত্ব, ত্যাগ, সংসার, সম্পর্ক - এসব শব্দের ভারে সে এতদিন নিজের অস্তিত্বটাকেই চেপে রেখেছিল। এইসব নিষ্ফল ভাবনার ভেতর দিয়েই ঘুমকে ডেকেছিল নিমিষা।

ঘুম হয়তো এসেছিল, কিন্তু বিশ্বাস আসেনি। চোখের নিমিষেই তার মন ছুটে গিয়েছিল সেইসব সময়ে, যেগুলো আর ফিরে আসে না, শুধু ফিরে ফিরে এসে কষ্ট দেয়।

‘সখি ভাবনা কাহারে বলে’ - রিংটোন বেজে ওঠে। ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

- কেমন আছো?

ফোনের ওপাশে পুরুষকণ্ঠ। অচেনা, তবু অস্বস্তিকরভাবে পরিচিত।

- পরিচয় দিন। - তার গলায় কোনো দ্বিধা নেই।

- এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?

নিমিষা হালকা হাসে। এই প্রশ্নটা সে বহু বছর ধরে প্রস্তুত ছিল শোনার জন্য।

- ভুলে যাইনি। মনে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আপনি কে?

একটু থেমে এসে নামটা পড়ে-

- আমি আর্য।

দশ বছর আগের এক নাম। এক সময় যে নামের

পাশে সে নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ লিখে রাখতে চেয়েছিল। আজ সে নাম কেবল ইতিহাস।

- বলুন। কেন ফোন করেছেন?

- জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কি এখনও সবার আগে সবাইকে রাখো?

এই প্রশ্নে একদিন সে ভেঙে পড়ত। আজ সে শক্ত হয়।

- না। এখন চারচুল বদলেছি। এখন আমি নিজেকে আগে রাখি। অনেক দেরিতে শিখেছি - তবু শিখেছি।

ওপাশে নীরবতা।

- আমি দেশে ফিরছি। দেখা হবে?

এই বাক্যটা একসময় তার জীবনের দিকনির্দেশ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। আজ আর নয়।

- দেখা হলে কী হবে? - নিরাবেগ প্রশ্ন।

- হয়তো পুরোনো কিছু কথা শেষ হবে।

নিমিষা হেসে ফেলে। এই হাসিতে এবার কোনো কষ্ট নেই - আছে বিদ্রুপ।

- পুরোনো কিছু কথা তো আমার জীবনে আগেই শেষ হয়ে গেছে আর্য। এখন আমি আর থামতে চাই না।

ওপাশ থেকে ভারী শ্বাস।

- এতটা বদলে গেলে?

- বদল নয়। এতদিন যে আমি ছিলাম না, আজ সেই আমি ফিরে এসেছি।

- তবু দেখা করো একবার।

নিমিষা জানালার দিকে তাকায়। বাইরের আলো এখন আর তাকে দুর্বল করে না।



- না আর্য। কিছু সম্পর্ক দেখার নয়, ছাড়ার জন্যই ছিল। তুমি স্মৃতি হয়ে থাকলেই নিরাপদ। বাস্তবে ফিরলে তুমি আবার আমার উপর অধিকার দাবি করবে-আর আমি আর কোনো অধিকার কাউকে দিতে চাই না।

- আমি তো তোমার ক্ষতি করিনি-

এই অর্ধেক বাক্যেই সে থামায় তাকে।

- না, তুমি করনি। কিন্তু তুমি দেখেও থামাওনি যখন সমাজ, পরিবার, দায়িত্ব-সব মিলিয়ে আমাকে আমার নিজের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। নীরবতাও একধরনের সহিংসতা, আর্য।

দীর্ঘ নীরবতা।

- শেষবারের মতো বলছি... - আর্যর কণ্ঠ নরম হয়। নিমিষাশর উত্তর আরও দৃঢ়-

- শেষ কথা আমি বলছি। আমি আর কারো অপেক্ষার মানুষ নই। আমি এখন নিজের হয়ে বাঁচি।

ক্লিক। লাইন কেটে যায়।

ঘরটা নিঃশব্দ। কিন্তু এই নিঃশব্দতা এবার পরাজয়ের নয়-এটা সিদ্ধান্তের।

নিমিষা ধীরে ফোনটা টেবিলে রাখে। বুকের ভেতর এখন আর শূন্যতা নেই-আছে এক অনিশ্চিত, কিন্তু নিজের বলে জানা এক নতুন স্বাধীনতা।

সে জানে, সমাজ তাকে এই স্বাধীনতার জন্য শাস্তিও দেবে।

কিন্তু সে এটাও জানে-

নারীর সবচেয়ে বড় অপরাধ সবসময়ই ছিল স্বাধীন হওয়া।

আজ সে সেই অপরাধটাই বেছে নিয়েছে। নিমিষা মনে মনে বলতে থাকে, তোমরা আমাকে সারাজীবন বলেছ- অপেক্ষা করো। বাবার জন্য অপেক্ষা, স্বামীর জন্য অপেক্ষা, সন্তানের জন্য অপেক্ষা, সমাজের জন্য অপেক্ষা। কিন্তু কেউ কখনো বলেনি- ‘নিজের জন্য বাঁচো’

আমি শিখেছিলাম কীভাবে চুপ থাকতে হয়, কীভাবে নিজের কান্নাকে শালীনতায় ঢেকে রাখতে হয়, কীভাবে স্বপ্নকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ বলে গলা টিপে মারতে হয়।

আমাকে শেখানো হয়েছিল- ভালো নারী সে-ই, যে

কম চায়, যার ইচ্ছা কম, যার কণ্ঠস্বর নিচু, যার জীবন অন্যদের সুবিধার জন্য সহজ।

আমি দায়িত্ব বয়ে বেড়িয়েছি কাঁধে নয়-মাথায়। ভালোবাসা দিয়েছি নিজের রক্ত দিয়ে।

তাগ করেছি এমনভাবে, যেমন কেউ নিজের অস্তিত্বটাকেই দান করে দেয়।

আজ তোমরা জিজ্ঞেস করো- ‘তুমি বদলে গেলে কেন?’

আমি প্রশ্ন করি- ‘আমি কি কখনো নিজে ছিলাম?’

যেদিন আমি নিজের কথা বলতে চেয়েছি, সেদিন বলা হয়েছে - এইসব মেয়েদের শোভা পায় না। যেদিন আমি নিজের স্বপ্ন দেখেছি, সেদিন শোনানো হয়েছে-আগে সংসার, পরে এসব। যেদিন আমি ক্লান্ত হয়েছি, সেদিন বলা হয়েছে - নারীরা তো এমনই হয়, সহ্য করতেই হয়।

আজ আমি আর সহ্য করব না। আমি আর কারো ‘দায়িত্বের তালিকা’ হয়ে বাঁচব না। আমি আর নিজের জীবন কাউকে ভাড়া দেব না। আমি আর আমার শরীর, আমার সময়, আমার মন- কোনোটাকেই সমাজের দানবাক্সে ফেলব না। তোমরা আমাকে ভালো মেয়ে বানাতে চেয়েছিলে।

আমি তাই হয়েছিলাম- এতটাই ভালো যে নিজেকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। আজ আমি আর ভালো হতে চাই না। আমি সম্পূর্ণ হতে চাই।

আজ আমি জানি- স্বার্থপর হওয়া অপরাধ নয়, নিজেকে বাঁচানো অপরাধ নয়, নিজের অধিকার চাওয়া অপরাধ নয়।

অপরাধ হল - একজন নারীকে এতটা ভেঙে ফেলা, যে সে নিজের জন্য দাঁড়াতেও ভয় পায়। আজ আমি দাঁড়াচ্ছি। কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে, কারও চোখের ভাষা বোঝার দায় না নিয়ে, কারও সুবিধার খাতায় নাম লেখাতে অস্বীকার করে।

আমি আজ ঘোষণা করছি - আমি আর কারো ছায়া হয়ে বাঁচব না। আমি নিজেই আলো হব। যদি এই আলো তোমাদের চোখে লাগে - তাহলে চোখ নামিয়ে নিও। কারণ আমি আর অন্ধকারে ফিরব না।



অতীতের টেস্ট ক্রিকেট: রূপ, রস, গন্ধ

প্রদীপ্ত দত্ত
(Chem ১৯৭৩)

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের কলকাতার অনতিদূরে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত মফস্বল শহরের যৌথ পরিবার।

দোতলা বিশাল বাড়ির একমাত্র বৃহৎ বেতার যন্ত্রটি মেজো জ্যাঠার ঘরের দরাজের ওপর অবস্থিত। গমগমে আওয়াজ। আওয়াজের মাত্রা একটু বাড়ালেই বাড়ির সর্বত্র শোনা যায়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সম্প্রচারের সময় (বেতার নাটক, শিশুমহল, মহালয়া ইত্যাদি) যন্ত্রটির আওয়াজের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সকলের শোনার জন্য।

শুক্রবার রাতে বেতার নাটকের সম্প্রচারের সময় মেজো জ্যাঠার ঘরের সামনের বারান্দা ও দোতলার বিশাল ছাদ ভরে যায় পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সমাবেশে। বড় জ্যাঠার জন্য নির্দিষ্ট আরামকেন্দ্র। মা, কাকিমা ও দিদিদের স্থান ঘরের ভিতর। ছোটরা এই অনুষ্ঠানে ব্রাত্য। অবশ্য ‘আলিবাবা’ ইত্যাদি নাটকের সময় অনুমতি পাওয়া যেত।

পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য উপরের গৌরচন্দ্রিকা করা।

পরিবারের সকলেই খেলাপাগল। বাবা, কাকারা সকলেই জেলা স্তরে ফুটবল, হকি ইত্যাদি নিয়মিত খেলেছেন। এক কাকা রাজ্যস্তরে নামকরা দৌড়বাজ ছিলেন। সাহেবদের সাথে পাশ্চাত্য দিয়ে ১০০ ও ২০০ মিটারে মেডেল জিতে ঘরে আনতেন। পরবর্তী কালে এই অধম সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছিলেন - ডিস্টিক্ট লিগে ক্রিকেট ও হকি খেলে।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে এবার আসল গল্পে আসা যাক। তখন ক্রিকেট খেলা হত শুধুই শীতকালে। দত্ত বাড়ির সামনের বাগানে (বাগান না বলে মাঠ বলাই ভালো) শীতের আমেজ আসতেই শুরু হত টেনিস বলে ক্রিকেট খেলা। পাড়ার ক্রিকেটপাগল সবাই ভিড় জমাত দত্তবাড়ির মাঠে। রবিবারের আসরটি হত আরও জমজমাট। কিশোর বেলায় আমিও যোগ দিতাম এবং সকলের প্রশংসা উপভোগ করতাম।

বিদেশি ক্রিকেট দল প্রায় প্রতি বছর শীতকালে হাজির হতেন ভারতে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি

ইডেন গার্ডেনে বসত টেস্ট ক্রিকেটের আসর।

ততদিনে বাঙালির রান্নাঘরে ক্রিকেট ঢুকে পড়েছে- মূলত ভাষ্যকার স্বর্গীয় কমল ভট্টাচার্য, অজয় বসু, পুষ্পেন সরকার ইত্যাদি ভাষ্যকারদের ধারাবিবরণী থেকে।

ইংরেজি সাহিত্যে ক্রিকেটকে উন্নীত করেছিলেন অবিস্মরণীয় স্যার নেভিল কার্ডাস। ক্রিকেট নিয়ে কাব্য রচনায় চরম রোমান্টিসিজমের স্রষ্টা। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি - ‘স্কোরবোর্ডটা একটা আস্ত গাধা’। বাংলা সাহিত্যও পিছিয়ে নেই। শঙ্করী প্রসাদ বসু বোধহয় পথিকৃত। গোথ্রাসে পড়ে ফেলেছি ‘ইডেনে শীতের দুপুর’, ‘রমণীয় ক্রিকেট’ ইত্যাদি। ক্রিকেট নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন স্বর্গীয় অচিন্ত্যকুমার বসু, মতি নন্দী প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যিকেরা। সব রচনাই ছয় দিনের টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে (একদিন বিশ্রাম)। আসলে টেস্ট ক্রিকেট ছিল সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানে ভরপুর - পরতে পরতে রোমাঞ্চ, মহান অনিশ্চয়তা আর বর্ণময় চরিত্রের ভিড়।

ইডেনে ক্রিকেট ছিল একটি উৎসব। পরিবেশ দূষণের প্রভাব তখন ছিল না বললেই চলে। জীবনের গতি এত উদ্দাম হয়নি। সর্বোপরি পেশাদারিত্বের রমরমা তখনও প্রবেশ করেনি। ক্রিকেট তখনও হয়নি এক লাভজনক বিপণন।

মফস্বল শহরে শীত বেশ জমে পড়েছে। রসনাসক্ত বাঙালি তখন মত্ত নলেন গুড়ের সন্দেশ, পাটালি, পোঁড়া গুড়, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, পারসে মাছের ঝাল ইত্যাদির আশ্বাদনে।

এরকম একটি শীতের সকাল। ভোরবেলা থেকেই বাড়ি সরগরম। মা, কাকিমা সকালেই উঠে পড়েছেন। রান্নাঘরে ব্যস্ততা। তৈরি হচ্ছে লুচি, আলুর দম, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদির আয়োজন। রাঙা কাকা সকালের ট্রেন ধরে কিট ব্যাগে খাবার ইত্যাদি গুছিয়ে ইডেন গার্ডেনে অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভারতের টেস্ট ম্যাচ দেখতে চলে গেলেন।



আমরা ছোটরা রোমাঞ্চিত। আশা করে বসে আছি কবে বড় হয়ে কাকার মতো টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাব।

পড়াশোনায় বিশেষ মন নেই আজ। ঠিক সাড়ে নটায় মেজো জ্যাঠার ঘরে রেডিও চালু। ইথারে ভেসে এল অজয় বসুর কণ্ঠ-

‘ইডেনের ক্রিকেট তো শুধু খেলা নয়, এ যে ক্রিকেটের মহোৎসব।’

কিছুক্ষণ বাদেই কমলদার কণ্ঠ ভেসে আসে। ভাবাবেগে আচ্ছন্ন মানুষটি, ভাষাতেও তার প্রভাব পড়ে। এককালের খ্যাতনামা বোলার। টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় ঘোরাঘুরি করেছেন কিন্তু সুযোগ মেলেনি।

কমলদা বোলার ও ব্যাটসম্যানের কাল্পনিক কথোপকথন ধারাভাষ্যে বর্ণনা করেন-

“বোরদে বল করছেন, লাল আপেলের মতো বল আস্তে করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাটসম্যান মনে মনে বলছেন-‘যতই লোভ দেখাও না কেন, দলের অবস্থা ভালো নয়, আমি ড্রাইভ করব না।’ পা বাড়িয়ে আস্তে করে কভারে ঠেলে দিয়েছেন।”

উন্মত্ত কমলদা আবার বলে উঠলেন-

‘শর্ট পিচ বল সপাতে ছক করেছেন, বল সোজা লেফট আউটে!’

হঠাৎ বেতারে নীরবতা। সামলালেন অজয়দা - কমলদা, বল সোজা স্কোয়ার লেগ দিয়ে, অর্থাৎ যেখানে ফুটবলে লেফট আউট থাকে, মাঠের বাইরে।’

কমলদা অদম্য। ব্যাট করতে নামছেন বিল লরি-

‘আসছেন বিল লরি, এ যে কত বড় লরি! এক বিশাল মাপের লরি-বলে বোঝানো শক্ত!’

বাঙালি মনন ক্রমশই ক্রিকেটাসক্ত হয়ে পড়ছে, সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব। বিখ্যাত কৌতুক শিল্পী জহর রায়ের কমিক রেকর্ড বেরোল পুজোর সময় ক্রিকেটের ধারাভাষ্যের অনুকরণে। যেমন- “ওদের ক্যাপ্টেন এসে জিজ্ঞেস করল ‘হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন?’ আমি বললাম ‘আই ইজ দ্য ক্যাপ্টেন’। ব্যাটা দেখলাম মুচকি মুচকি হাসছে...”

হঠাৎ মাঠে প্রচণ্ড সরগোল, হাততালির আওয়াজ। জিজ্ঞেস করলাম পাশের জনকে - ‘দাদা কী হলো?’ তিনি হেসে বললেন - ‘আউট LBW’। কিছুক্ষণ পরে গ্যালারির ওপর থেকে একজন হুড়মুড় করে পড়লেন নিচে। চিৎকার উঠল - ‘গেল গেল, এটাও গেল!’ জিজ্ঞেস করলাম - ‘দাদা, এটা কী হলো?’ উত্তর এল-‘এটাও LBW, মানে Loaded Belly with wine।’

ক্রিকেট অঙ্গনে বাঙালির অবস্থা বড়ই কঙ্গাল (পরবর্তীকালে অবশ্য সৌরভ এসেছেন)। সেই সময় একা স্বর্গীয় পঞ্চজ রায় টিমটিম করে জ্বলছেন। প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান। যতক্ষণ উইকেটে থাকেন বাঙালির হৃদয় আটকে থাকে গলায়।

ফিরে আসি আবার দত্তবাড়িতে। ক্রিকেটপাগল কিশোর নাওয়া-খাওয়া ভুলে মগ্ন ধারাবিবরণীতে। সন্ধ্যা নামে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা-কখন রাঙা কাকা ফিরবেন মাঠের গল্প নিয়ে। একটু রাত করে কাকা ফিরলেন। সঙ্গে ইলাস্টিক লাগানো অর্ধচন্দ্রাকার রোদ-প্রতিরোধক টুপি। দু-একটা জুটেও যায় কিশোরের ভাগ্যে। প্রশ্রবানে পরিশ্রান্ত কাকা-মাঠের নানা গল্প, কে কেমন খেলল, কোন বিদেশি দলের খেলোয়াড় দর্শকের কাছ থেকে কমলালেবু চেয়ে খেলেন, ইত্যাদি।

রাতে ঘুম নামে। স্বপ্নের রাজ্যে ভেসে যায় কিশোরটি- খেলার মাঠের বর্ণে, গন্ধে মাতোয়ারা রঙিন ছবি। প্যাড, গ্লাভস পরে পঞ্চজ রায়ের সঙ্গে ওপেন করতে চলেছে কিশোরটি। ইডেনের মখমলের মতো নরম ঘাস মাড়িয়ে চলে যায় উইকেটের সামনে। পঞ্চজদা বললেন, ‘ডেভিডসনকে একটু দেখে খেলো।’ গার্ড নিয়ে কিশোর তৈরি। আসছেন ডেভিডসন, অফ স্টাম্পের ওপর আউটসুইং বল করলেন- পা বাড়িয়ে স্কোয়ার ড্রাইভ করতে যাবে-এমন সময় মায়ের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্ন ভেঙে যায়।

কিশোর ক্রমে বড় হয়েছে। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে চাকরি, সংসার ইত্যাদি সামলে এক দায়িত্ববান পুরুষ। মোটামুটি সফল এবং সুখী। ক্রিকেটের আকর্ষণ কিন্তু এখনও বহমান। অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ক্রিকেটের ঐতিহ্যময় জমানায়-এসেছে সীমিত ওভারের ক্রিকেট, রাতের ক্রিকেট, একদিনের ক্রিকেট ইত্যাদি। প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এখন সয়ে গেছে।

ক্রিকেট এখন এক বাণিজ্যিক পণ্য। এককালে সততা ও সৌজন্যের নিদর্শন ছিল ক্রিকেট। অশালীন ব্যবহারকে বলা হত - ‘It is not cricket।’ স্লেজিং-এর যুগ সেই ধারণা পাল্টে দিয়েছে।

প্রতিভাবান ক্রিকেটার আজও আছেন এবং আমরা সমৃদ্ধ হই তাদের খেলা দেখে। স্থাপিত হচ্ছে নতুন কীর্তিমান। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রতিভারাও আজ উঠে আসছেন স্পনসরশিপের সহায়তায়।

কিন্তু তবুও মন চলে যায় বারবার সেই পঞ্চাশের দশকের দিনগুলিতে। কী যেন নেই... মাঝে মাঝে মনে হয় - ‘দাও ফিরে সেই অরণ্য।’



সমাজসেবী

ডঃ অমলেন্দু দত্ত

(Chem ১৯৬৪)

নাম কি তোমার? - ছিদাম কুমার।
বাড়ি কোথায়? - ঝিকরেপোতায়।

কি করা হয়? - জোন খাটা হয়।

ধোপদুরন্ত সহযাত্রীর ছোট কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরেই পাশে বসে থাকা ওই সাধারণ ছেলেটির পরিচয়টা প্রায় পরিষ্কার। আর সেই অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ের কথা এবং ব্যবহার শুরু হল। ট্রেনের হঠাৎ ঝাঁকুনিতে ধোপদুরন্ত সহযাত্রী খেঁকিয়ে উঠলেন ‘ঘাড়ের ওপর পড়ছ কেন? ওদিকে সরে বস না কবে যে এই দেশের মানুষগুলো একটু এটিকেট শিখবে’। ছেলেটি বলল ‘বুঝতে পারিনি স্যার’, সহযাত্রী ফুঁসে উঠলেন ‘যত্ন সব’।

‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার ব্যাগটা নিয়ে আমায় নামিয়ে দেবে বাবা? আমি সামনের স্টেশনে নামব।’ সামনের সিটে বসা এক বৃদ্ধার কাতর অনুযোগ। সবাই না শোনার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, লোকাল ট্রেনের এই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে ব্যাপারটা সহজ নয়, আমার উসখুস ভাব দেখে সেই অতি সাধারণ জোন খাটা মানুষটি বলল ‘ভাববেন না ঠাকমা আমি নামিয়ে দেব, আপনি আমার পিছনে পিছনে চলে আসুন’, বলে অনায়াসে ভারী ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে সবাইকে ঠেলেঠেলে ওনাকে নামিয়ে দিয়ে এসে এবারে আমার পাশে এসে বসল ঝিকরেপোতার জোনমজুর ‘ছিদাম’। ওর স্পর্শে আমি ধন্য হলাম।

কলকাতা থেকে বসিরহাট যাচ্ছি ৭৯ নম্বর বাসে, দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছি। কোঙ্গার হাটে গ্রামের এক সাধারণ মুসলমান চাচা বাসে উঠল, একহাতে বড় একটা নেটের

ব্যাগ আর অন্য হাতে সবজিভর্তি বাজারের থলে। আমার সিটের পাশে এসে বলল ‘কতটা এটা একটু ধরবেন? নেটের মধ্যে দেখি একটা বড় মুর্গি, নির্দিধায় মুরগীটিকে আমার কোলে চাপিয়ে আমার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘না না ভয় নেই, ওসব আমি বাসে ওঠার আগে করিয়ে নিয়েছি’। গ্রামের সরল সাধারণ রসিক মানুষ!

একটু পরে প্রায় চলন্তবাসেই লাফিয়ে তিনটে যভামার্কি ছেলে বাসের পাদানিতে উঠে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই চাচা চৌকিয়ে উঠল, ‘কত্তারা সবাই যে যার জিনিষপত্রের পকেট সামলে রাখবেন, দিনকাল একদম ভালো না’।

ওদের মধ্যে একটা ছেলে কটমট করে চাচার দিকে তাকাল আর তার একটু পরে আবার লাফিয়ে বাস থেকে নেমে গেল তিনজনেই।

থাকতে না পেরে আমি চাচাকে জিগেস করলাম, ‘চেনেন নাকি ওদের?’

‘খুব ভালো করেই চিনি, আমাদের পাশের গ্রামের কথা ছেলে, সহজে পয়সা আয় করার চেষ্টা, বদমায়েসগুলো জানে না -- আল্লা সব দেখছে।’

বললাম, ‘কিন্তু ওরা তো আপনার ক্ষতি করতে পারে।’

‘হ্যাঁ, সে তো করতেই পারে, কিন্তু তাই বলে সমাজের ক্ষতি চুপ করে দেখব নাকি?’

একটু পরে স্বরূপকারে চাচা নেমে গেল আর আমার মনের মধ্যে রেখে গেল সমাজবদ্ধ মানুষের একটা অপূর্ব সংবেদনশীল মানসিকতার ঝলক।

এখন শুনি সমাজের উঁচু মহলে পঞ্চাশ ষাট বছরের



উদ্ভের মানুষদের একটা আকাঙ্ক্ষিত ও সম্মানীয় নেশা হল — ‘সমাজসেবা’। আমি আমার গুরু কাম বন্ধু ডাক্তারভাই ‘মেজদাকে’ বললাম, ‘সে আবার কি? সমাজসেবা কি আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে করতে হয় নাকি?’

আমি গ্রামের ছেলে, আমরা তো ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি আসে পাশে বা গ্রামের কারোর কিছু অসুবিধে হলে পাশে দাঁড়াতে হয় ও একটা সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। আমার আর আমার বন্ধু পল্টুর তো প্রায় রুটিন কাজ ছিল গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে একটা চটের বস্তায় ভর্তি করে গ্রামের গরিব বিধবা রানী পিসীমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া কারণ ওইগুলো দিয়ে পিসীমা রান্না করবে, সুনু আর গপুকে অংক বোঝাতে হবে, কারণ অংকটা ওদের ঠিক আসে না, আশী বছরের কবিরাজ মশাই-এর বাজারটা বয়ে দিতে হবে, নরেন দাদুর কলকাতায় থাকা ছেলেকে চিঠিটা লিখে দিতে হবে কারণ দাদু ভালো দেখতে পান না, গ্রামের খানা খন্দগুলো মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে, ইলাদের বাড়িতে রাতে শুতে যেতে হবে কারণ গোবিন্দদা চাকরির জন্য বাইরে গিয়েছে আর কাকিমা একা আছেন ছোট মেয়েদের নিয়ে। আর এসব ছাড়া এটা-ওটা হঠাৎ বিপদ তো লেগেই আছে। তারপর একটু বড় হয়ে মৃতদেহ দাহ করতে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া, গ্রামের অসুস্থকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করা, বিয়ে, অন্ত্রাশন ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে শেষ শক্তি পর্যন্ত লড়ে যাওয়া, ইত্যাদি সবই তো আমরা গ্রামের সবাই মিলে করতাম। এসবের জন্যে আমাদের একটা দলও ছিল, সবটাই ছিল স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। আমরা জানতাম এগুলো আমাদের নিজের কাজ, কেউ জানতামই না যে এই কাজগুলো সব ‘সমাজসেবা’র মধ্যে পড়ে। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে বড় শহরের উঁচু সমাজে এসে ‘সমাজসেবা’র নতুন পরিভাষা জানতে পারলাম।

আমার গুরু কাম মেজদা ডাক্তার ছিল, ১৯৯২ সালে মারা গিয়েছে। বেঁচে থাকার সময়ে রোগীদের কাছ থেকে লাউ, কলা, মূলোটা নিয়ে গ্রামের মানুষগুলোর চিকিৎসা করত। কিন্তু মেজদার সঙ্গে এখন ওসব বিষয়ে আমার নিয়মিত আলাপ আলোচনা হয়।

মেজদা বলল, ‘তুই আগের মতন বুদ্ধিই রয়ে গেলি, এটা বোঝবার চেষ্টা করছিস না কেন, আসলে সবাই তো যে যার জীবনে নিজের নিজের বিষয়ে দিকপাল হবার চেষ্টা করবে খুব বড় হার্টসার্জেন, খুব বড় ‘ইঞ্জিনিয়ার’, খুব বড় ‘এক্সিকিউটিভ’, খুব বড় ‘বৈজ্ঞানিক’ বা ধর আর

কিছু না হতে পারলে নিদেন পক্ষে খুব ‘বড় নেতা’। আর এসব হতে গেলে আর সব কিছু মানে তোর ওইসব লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার সমাজসেবা তো বাদ দিতেই হবে। আর এত কিছু করে উঁচু পদে পৌঁছতেই তো পঞ্চাশ-ষাট বছর পার হয়ে যাবে’।

আমি বলার চেষ্টা করলাম, ‘বাঃ, কি সুন্দর কথা! ততদিনে তো সেই দিকপালদের আত্মীয় বা আসেপাশের সঙ্গীসাথী সেই অভাগা লোকগুলো সব টেসে যাবে আর তাদের সেই প্রয়োজনগুলোই আর থাকবে না।’

মেজদা বলল, ‘তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল, আসলে জানিস বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে তো বিসর্জন দিতেই হবে।’ মেজদা বলেই চলল, ‘আর এটাও বোঝবার চেষ্টা কর যে এইসব দিকপালেরা যখন স্টেজ আলো করে বসবেন আর মনোজ্ঞ ভাষণ দেবেন তখন ‘সমাজসেবা’র পরিভাষাটাই এনারা পাল্টে দেবেন, মানে সমাজের সব ধনী বড়লোকেরা আর কোম্পানিগুলো অনেক অনেক অর্থ দান করবে আর সেই টাকাতে কত সমাজসেবা হবে কত স্মৃতিফলক বসবে। দেখবি কত সরকারি বেসরকারী সংস্থা গড়ে উঠবে সমাজসেবার জন্য। দেশজুড়ে একটা নতুন আলোড়ন আসবে, নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশনে দেশ ছেয়ে যাবে আর ব্যবসার একটা নতুন দীগন্তপ্রসারী রূপ দেখতে পাবি’।

আমার ভেতরের রাগটা আর চাপতে পারলাম না, ‘হ্যাঁ একেবারে ঠিক কথা! কত লোকে এই সুযোগে করে খাবে, দানের পয়সায় দিব্যি পায়ের ওপর পা তুলে সংসার চালাবে, পরের ধনে পোদ্দারি করবে, আর সেইসঙ্গে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে তাদের ‘সেরা সমাজসেবী’র কত খেতাব ও মিলবে।’

মেজদার অভিযোগ, ‘তুই দেখছি বাবার মতন কথা বলছিস আরে যুগের সঙ্গে পায়ের পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তা চলার নামই তো জীবন’।

‘মেজদা, তোমার মনে আছে কিনা জানি না’, আমি মনে করাবার চেষ্টা করলাম, ‘আমি যাদবপুরে পড়বার সময় এক বর্ষাকালে আমাদের হোস্টেলের ধোপাকে বাবার দেওয়া ছেঁড়া ছাতটা দিয়ে দিয়েছিলাম, বাবা পরে জানতে পেরে বলেছিলেন, ‘খুব ভালো কথা, বুঝলাম তোমার মনটা ভালো, তবে একটা কথা বলে রাখি, ভবিষ্যতে পরের ধনে পোদ্দারি না করে নিজের কষ্টার্জিত পয়সাতেই দান করার চেষ্টা কোরো’।

আমরা জানতাম আমাদের বাবা কথা ও কাজে এক।



সম্প্রতি ২০২৫-২৬

ডাক্তারি পাশ করে বাবা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসা করতেন। যদিও চাষবাস ও জমিজমা থেকে যা উপার্জন করতেন সেখানে বাছল্য কোথাও ছিল না। আমাদের সংসার মোটামুটি ঠিক চলে যেত।

মানুষ তো সমাজবদ্ধ জীব, সুতরাং সমাজকে বাদ দিয়ে সে কি করে বাঁচবে? এটাই তো তার প্রাকৃতিক ধর্ম, সে তো দরকার পড়লে অন্যের পাশে দাঁড়াবেই। আমি জানি না কেন আবার নতুন করে জানতে হবে সমাজসেবার নতুন পরিভাষা! এই ঢাকটোল বাজানোই বোধ হয় নতুন সমাজের অবক্ষয়ের এবং অধোগতির একটা পরিচয়। অথবা হতে পারে স্বার্থভিত্তিক ব্যবসা, চাকরি, সুযোগ সুবিধার এ এক নতুন অধ্যায়। সব দিক চিন্তা করে মনে হয় সব ঠিকই

আছে। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে মেজদা বোধহয় ঠিকই দেখতে পাচ্ছে -- ছিদাম, দেগঙ্গার চাচা, আর ওদের মতন বেশ কিছু মানুষ সবার আড়ালে থেকে সমাজের অন্য মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েই চলেছে কোন রকম প্রতিদানের আশা না রেখে। এই মানুষগুলোর কর্মফল তো বৃথা যেতে পারে না।

আসুন সবাই মিলে জগজ্জননী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি ‘মা, আমাদের শক্তি দাও, নির্ভয় নিদার্ত নিক্ষাম মন দাও যাতে করে আমরা অন্যের সাহায্যে আসতে পারি, আর আশীর্বাদ কর এই সেবাতেই যেন তোমার পূজা সম্পূর্ণ হয়।’

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥



অরবিন্দ ভবন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছিল নিরীহ পতঙ্গ, হয়ে গেল আতঙ্ক

অলোক দাশগুপ্ত

(Arch ১৯৭৯)

আজকাল কম্পিউটার শিক্ষিত (computer literate) না হলে কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে টিকে থাকা বেশ কঠিন, বলতে গেলে একরকম অসম্ভব। আমি কম্পিউটার অঙ্ক বললে লোকে হাসাহাসি করবে। পৃথিবীতে আজ প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ আইওটি/মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। আমাদের দেশেই ৯৬ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আছেন (২০২৫ সালের হিসেব অনুযায়ী) আর প্রতি বছর সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। তবে কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলে একটা প্রবলেম বা হ্যাপা থেকে ভীষণ সজাগ থাকতে হয় — সেটা হল কম্পিউটার বাগ (computer bug)। হ্যাঁ, রয়েল বেঙ্গল বাঘের মতন বিপজ্জনক বটে আর কোনো না কোনো সময় আমরা অনেকেই এর খপ্পরে পড়েছিলাম আর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

আচ্ছা, বলুন তো এই ধরনের কম্পিউটার বামেলাকে ‘বাগ’ বলে কেন? এরকম না বলে তো অন্য কিছু বলা যেতে পারত যাতে করে সমস্যাটাকে বোঝান যেত যেমন ‘কম্পিউটারে ক্ষতিকারক বা বিদ্বৈষপূর্ণ জিনিষ।’ বাগ মানে তো পতঙ্গ বা পোকা মাকড়। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাহলে কম্পিউটার আর পতঙ্গের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? ঠিক ধরেছেন। ফেলুদার কথায় বলতে গেলে, ‘আছে, আছে যোগ আছে!’ আর সেই ব্যাপারটা নিয়ে লিখব এখানে।

কম্পিউটারে পতঙ্গের কথা বলতে গেলে কম্পিউটারের ইতিহাসের গোড়ার দিকে চলে যেতে হয়। চার্লস ব্যাবেজকে

অনুসরণ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র, হাওয়ার্ড একেন (Howard Aiken) তার গণনামূলক গবেষণার কাজের জন্যে ১৯৩৭ সালে মার্ক ওয়ান একেন রিলে ক্যালকুলেটর (Mark I Aiken Relay Calculator) বানিয়েছিলেন, তারপর ১৯৪৭ সালে সেটাকে আরো উন্নত করে মার্ক টু (Mark II) ক্যালকুলেটর অর্থাৎ কম্পিউটার তৈরী করা হয়। এই মার্ক টু কম্পিউটারে একদল বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা একটা বিশেষ কাজ করছিলেন। ১৯৪৭-এর ৯ই সেপ্টেম্বর কাজে এসে ওনারা দেখেন যে কম্পিউটার ঠিক ঠাক কাজ করছে না, ভুল গণনা দিচ্ছে। তখন সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করল কি কারণে এই রকম হচ্ছে। প্রথমে কম্পিউটার প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখা হল। দেখা গেল সেটা ঠিক আছে, তাতে কোনো গলদ বা ভুল নেই। যন্ত্রপাতিও কোথাও বিকল হয়ে যায়নি, সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু ক্রমশ অবস্থা এমনই খারাপ হয়ে গেল যে সকাল দশটায় কম্পিউটারটাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হল, সেটা তখন একেবারে ভুলভাল কাজ করছে। তারপর গ্রেস হপার (Grace Hopper) নামে এক বিজ্ঞানী তার দলবল নিয়ে কম্পিউটারের সব জায়গায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন - গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছে আর কেন হয়েছে। সেই সকাল ১০:০০ থেকে বিকেল ৩:৪৫ পর্যন্ত প্রায় ছয় ঘন্টা লাগাতার খোঁজাখুঁজি করে তারা অবশেষে সমস্যাটা আবিষ্কার করলেন, তারপর সেটাকে বিকেল ৪:৩০ মধ্যে পুরোপুরি ঠিক করতে পারলেন।

কি ছিল সেই মারাত্মক সমস্যাটা? প্রবলেমটা আর



9/9

0500 Action started
1000 stopped - action ✓
13'00 HP - AG
030 PRO 2
convd
Relays 6-2 in 033 field speed test
in relay 11.00 test.

1100 Started Relay changed
1525 Sine Tape (Sine check)
Started Multi Adder Test.

1545 Relay #70 Panel F
(mth) in relay.

First actual case of bug being found.
1650 Action started.
1700 closed down.

13.270 9.020 577 025
9.117 876 995 convd
2.130776015 (5-2) 7.615725059 (-2)
2.130776495
2.130676495

Relay #70 Panel F
(mth) in relay.

সেই ঐতিহাসিক নোটঃ

কি কি লিখেছিলেন (এখানে তার একটা প্রতিচ্ছবি দেওয়া হয়েছে)।

ভাবুন দেখি একটা ছোট্ট মথ কি কক্ষণে যে কম্পিউটার মধ্যে ঢুকেছিল আর তার নামটা কিভাবে একটা মারাত্মক ক্ষতিকারক জিনিসের সাথে জুড়ে গেল। গুগলে একটা লেখায় দেখলাম যে ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ৯৫,০০,০০০ কোটি টাকা খরচা হয়েছিল এই বাগ বা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে, যেটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কি মারাত্মক ব্যাপার বলুন দেখি! ছিল একটা ছোট্ট নিরীহ পতঙ্গ হয়ে গেল বিশ্বের আতঙ্ক।



অরবিন্দ ভবন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



AGM 2025-26



Bhoj Koy Jahare, August 2025



Bijaya Sammilani, October 2025



Annual Conference, November 2025



Outbound trip to Mukteshwar, April 2026



Annual Picnic, February 2026



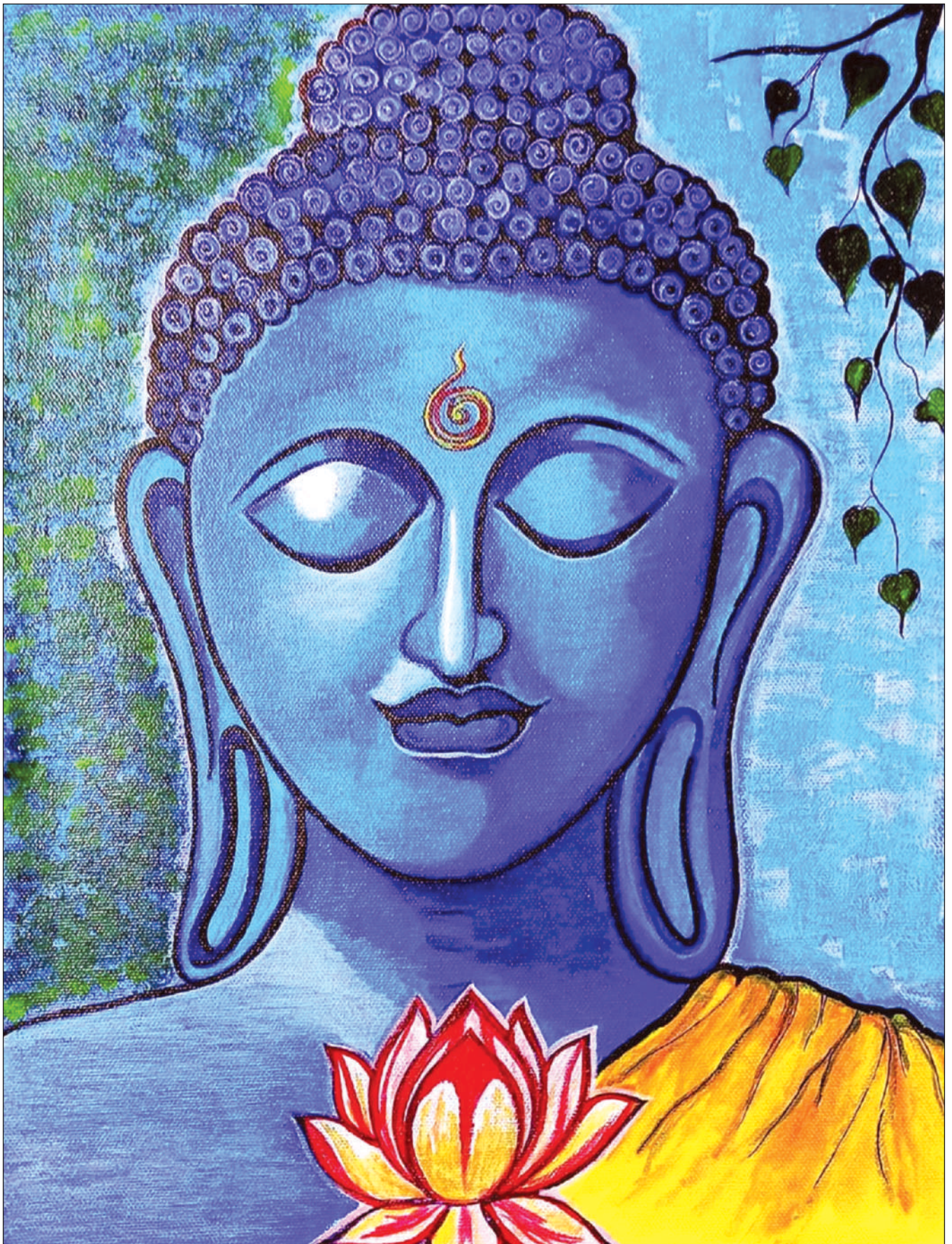
Triguna Sen Memorial Lecture, March 2026



Painting by Adhirit Bhattacharjee (S/o Sayani Mitra, MSc BioTech, 2008)



Painting by Abhigyan Biswas (S/o, Srabani Biswas (Com.Lit. 2008))



Painting by Debarati Malakar (w/o Srikumar Malakar, CH 2004)



Photography by Sriya Malakar (d/o Srikumar Malakar, CH 2004)

Australian Sojourn

Cdr Samir Roy Choudhury (Retd)
(EE 1968)

Around end August 2025 myself and a few friends with wives decided to go on a tour to the east coast of Australia. After lot of brainstorming we decided to visit Melbourne, Cairns, Brisbane, Gold Coast and Sydney in early December and hectic preparations started for air travel, hotel and surface transport reservations.

Finally the D – Day arrived. After an uneventful but tiring air journey we reached Melbourne. Australia is very strict as far as bringing in of food items or biological/animal products are concerned. While waiting for our luggage in the carousel area we saw Sniffer dogs and their trainers. We went out and met our local guide who escorted us to hotel, Courtyard Marriot Flagstaff Gardens.

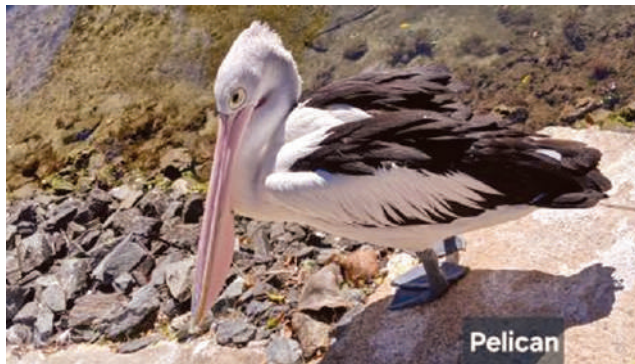
Our first day's tour of Australia started at Melbourne. We drove along the Great Ocean Road in southwest Victoria. This is a scenic road 200 kms long running alongside the ocean. The original road was built by hand by the returning soldiers of World War I between 1919 and 1932, by using picks, shovels, axe and horse drawn carts. After the war they had no source of employment and did this to earn a living. They installed Toll gates to charge travellers and generate income. The Government took over the road in 1952, built a proper metalled one and abolished the Toll gates.

Though the ocean scenery was very nice but it was monotonous. Half way through the bus stopped at a vantage point where people got down to spread their limbs and take photographs. Then we moved on to another viewpoint from where we could see vertical rocks jutting out of the sea close to the coast. Initially there were twelve such rocks and hence called “The Twelve Apostles”. But now there are only Five left because of erosion. We saw old pictures of the original twelve at the site in a Tourist Office offering information.

After lunch we drove through a ‘Rain Forest’ for about 30 minutes. The path was through a relatively dense forest of Eucalyptus. After emerging from the forest we came to meadows where Merino sheep and Australian cows were grazing by the hundreds. On way back, went to



Baby Kangaroo



Flinders Street Railway Station, a building built on Baroque style. It is a very big railway station (much like Chatrapati Shivaji station in Mumbai) with trains connecting to all parts of Australia. The building was very nicely lit up at night.

Next day we started with Melbourne City Tour, navigating various quarters of the city. Saw the two main schools which give quality education to the deserving boys and girls. The boys school has produced three Prime Ministers of Australia. Then went to St. Patrick's Church, the presiding deity of the city. It has sprawling gardens with flowing fountains. Thereafter to the Melbourne Cricket Club ground. There is a statue of the famous fast bowler Dennis Lillee bowling in his famous flowing action.

After lunch flew to Cairns where stay was in hotel 'Pacific' on The Esplanade facing a Ferry Jetty. After night's rest went to Kuranda National Park next day. The Park is in a Rain Forest with numerous walking trails. There is a Butterfly Park and a Shopping Complex with a large canopied restaurant. After a bit of acclimatisation, we started on a trail walk in the Rain Forest. We chose a trail which showed about 90 minutes to complete. The trail was winding up and down, through brooks and canals and rickety wooden bridges and lot of such challenging paths. When we reached the halfway mark we were already walking for more than an hour. We completed the walk in 2 hours and 10 minutes. About a kilometre of the trail was along the Murron River and was very nice to walk. All along there were shady trees. Overall the walk was very satisfying through sun and shade.

After lunch we visited 'Kangaroo Park'. A vast expanse of more than 20 acres of barricaded

land. There were more than 100 kangaroos of different sizes and age in various groups. Some were playing but most were resting under trees. We watched the pranks of those who were playing and the ease with which the others were resting.

Next day proceeded to the Boat jetty across the Park to go to 'Green Island' to enjoy pristine island with corals around. The day was very bright and sunny. The Ferry was quite comfortable with an open Upper Deck and an air-conditioned Lower Deck cabin. After about ninety minutes the Ferry brought us to Green Island, one of the islands in the vast Great Barrier Reef. Habitation in this island is not allowed and all tourists, shop owners, restaurant owners and other workers have to leave the island by sunset.

Initially we explored island's nice green forests and white sandy beaches. Then we took rides once on a glass bottomed boat and once in a glass bottomed submarine. In each of these trips we saw lots of corals and marine life. Mainly fishes of different types, sizes and hues and some sharks apart from various types of corals of different colours, size and shapes. Some of the corals were flexible and swaying with the sea water currents. On the way back lunch was served on board the ferry. Reached back around 5 pm. Explored the local market which is housed inside a building. All touristy items – trinkets, sandals, dresses, souvenirs magnets etc. There is a Night market too. From 7 pm till midnight.

Next day we caught our flight to Brisbane. At Brisbane airport collecting and navigating with luggage was very confusing. Finally we got into the bus after a lot of exercise and proceeded to Gold Coast which was about 45 minutes drive away. We were lodged in 'Novotel' hotel which





was next to the beach.

After a good night's rest next day we went to an Amusement Park called Movie World. There were various activities and shows which came with the ticket. First we went to a 3-D show in a movie hall. It was showing The Wizard of OZ. We were transported to our school days.

We took 3 rides and all of them were very interesting, exciting and enjoyable. We did not take the Roller Coaster rides as found them to be too scary. Apart from the rides there were other shows too which take place at scheduled times. We saw the 'Stunt Motor Driving Show'. This takes place in a rectangular arena on one side of which there are stadium like seats. We took our seats. Then two cars came at full speed out of nowhere and started driving like crazy, doing a lot of stunts. It looked very dangerous but the drivers must be experts and performed with ease. This was a treat to watch.

After lunch we moved around exploring the Park. Towards closing time there was a gala parade of all performers and vehicles. They went up the main street and back the same way. This was a treat to watch. Everyone was sitting on the roadside or on the lawns alongside. Once the parade was over back to the hotel. We went for a walk along the beach where there was a memorial to the fallen soldiers. The sea was very soothing and the waves were very smooth.

Next day was a trip to another very big Marine Animals park called "Sea World". Apart from live animals and animal shows this also had rides for all ages. We started our visit with

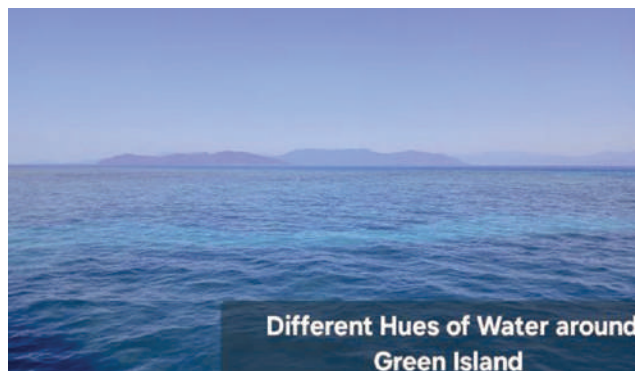
'Penguin Show'. This was inside a big enclosure with controlled environment and a secondary enclosure with artificial snow and landscaped like the Antarctica. We were watching from behind glass enclosures. The penguins were very playful. We were mesmerised by their behaviour. Next we went to an enclosure housing different types of Jelly Fishes. There were many different types of Jelly fishes and some of them were luminescent ones.

Thereafter we went to see the Seal show. Saw different types of Seals and their trainers. The seals were performing various acrobatic activities under instructions from the trainers. This also was a treat to watch.

Then we went to the Sharks Feeding area. There were different types of Sharks, all in open shallow artificial ponds. Their bodies were very slippery to touch. They were being fed with mussels, small squids, fishes etc. There was also a very large Sharks aquarium. Here sharks up to eight feet long and Sting Rays up to five feet diameter along with smaller ones were moving about. Against the glass partition one could see the underside of the sharks – with fins, mouth and air gills.

Then there was the Dolphins show. This is held in a big lake, thoroughly enjoyable and out of the world. The group of Dolphins and their trainers did such wonderful and extraordinary acrobatic shows that we were awestruck. These dolphins really have intelligence.

The most interesting part of the park was the Grand Finale Show – Thunder Lake Stunt. There were high speed boats on the lake pulling Water-ski performers doing unimaginable acrobatics





Stunt Drive Cars

in water and then gliding into the sandy shore. Bicyclists coming down steep inclines and then jumping into water. Awesome.

Next day went for DuckBus ride after breakfast. This is a bus which runs on roads as well as in shallow lakes and water bodies. After lunch to airport to catch evening flight to Sydney. We reached Sydney after sunset. These airports have much less facilities than the Indian ones. They did not have aerobridges and access to aircraft was walking through tarmac from the boarding gate and climbing gangway ladders. From Sydney airport we were brought by bus to Hotel Holiday Inn at Potts Point. This hotel is right on a very busy traffic crossing.

Next day to Featherdale Wildlife Park. It is actually a zoo with lots of Australian wildlife birds, snakes, reptiles etc like Koalas, Kangaroos, Wallabys, Wombats, Emus, Dingos, Sheep etc. Except the snakes all others were quite in the open. No enclosed barriers. The birds and animals were friendly and we could touch them. In fact, in the Parrots enclosure they all were eating out of our hands and sitting on our shoulders and head. The bird food was given by the bird-keepers. It was a thrilling experience.

Then we went to the Blue Mountain National



Park. It was a vast area with Hills, Valleys and Ridges. From some view point we could see three peaks – they were called the Three Sisters. In a part of this park there used to be a coal mine. The rail wagon which used to take the miners down is now used to take tourists down to give experience. It is a steep downhill track at about 52 degrees slope. The way up was from a different point. It was a cable car up a similar incline. Very exciting.

Finally day came for departure from Australia. Morning was spent at iconic Sydney Opera House. This is a grand structure which epitomises Sydney. This can be seen in all picture postcards. The Opera House is a really imposing structure. It is constructed over a vast area. There are two levels where one can go around the structure. Lower level is full of small eateries. This is on Sydney Harbour – so open to the sea. In one of the stone staircases going down to the water we saw a ‘seal’ sunbathing. We could also see the Sydney Harbour Bridge. After lunch we went to a view point from where we could see the entrance to Sydney harbour with a peak jutting out on the other side of the water. This is where early seafarers landed. Then we went to Bondi Beach. Oh my!

Happy Memories.

Random Thoughts on My Offering of Photos

Utpal Kanti Deb
(Ch.E., 1964)

Photography is very helpful in freezing passing time and preserving it as an Image which can be saved for eternity. It helps us to record passing moments such as birthdays, weddings, landscapes, street scenes, static and dynamic objects, etc. I have been interested in photography since the day my older sister presented me with a Kodak box camera when I was a teenager. Unfortunately, I could not practice continuously during my younger years. I started seriously as an amateur quite late in life and most of my photos were taken post retirement. Today I have presented 9 images for the Magazine. A short write-up on each photograph is given below.

Image 1: This is a shot of the Belur temple - not to be confused with the Belur Math established by Ramakrishna Mission. The temple shown here is a temple dedicated to Lord Vishnu (locally called Chennakeshava) and located near the city of Hassan in Karnataka state. It is about 220km from Bangalore. The South is famous for its temples and Karnataka has many beautiful ones known for excellent stone carving. The belur temple was built in the 12th century by King Vishnuvardhan of the Hoysala Dynaasty. This temple took over 100 years to build and is renowned for its intricate detailed carvings.

The photo shows the temple being supported

by three layers of animals. The lowest layer taking the maximum load is made up of elephants. These are supposed to be the strongest animals and are therefore put in this position. The whole structure is covered with delicate carved panels. At different levels we can see small individual temples mostly with images of Vishnu.

This temple has been declared as a World Heritage Site by UNESCO in 2023. It was plundered many times and repeatedly rebuilt. The temple artwork depicts scenes of 12th century life - dancers and musicians and scenes from





Mahabharata, Ramayana and the Puranas. The temple is located in a large courtyard. It is a site worth visiting and a must-see for anyone visiting Karnataka.

Image 2: This photo is also from the Belur temple. It is an independent panel on the temple wall showing Lord Vishnu seated with the Goddess Lakshmi on his lap. They are surrounded on either side by two maidens, one fanning them with a fan. On either side of the central panel, we have two smaller panels depicting two flute players. This heavenly scene is one of the gems of the Belur temple complex and definitely worth a visit.



Image 3: Hoysaleswara temple, also referred simply as the Halebeedu temple, is a 12th-century Hindu temple dedicated to the god Shiva. It was built on the banks of a large man-made lake, and sponsored by King Vishnuvardhana of the Hoysala empire. Its construction started around 1117 CE and was complete in 1235 CE. It is 30 kilometers (19 mi) from Hassan city and about 210 kilometres (130 mi) from Bangalore. Like the temple at Belur, the temple at Halebeedu was also plundered by marauders from the north but its beauty is still preserved to a large extent. It is noted for its sculpture, intricate reliefs, detailed friezes, as well as its history. It also has two temples devoted to Nandi, the vahana of Shiva, outside the main temple. The Halebeedu temple was also declared as a World Heritage Site in 2023 along with the Belur temple and another Hoysala Vishnu temple at Somnathapura, near Mysore. My Image No 3 is a typical carved panel at Halebeedu showing the dual figures of Lord Shiva and Devi Parvati. The main figures, large



and intricately carved. They are surrounded by many smaller figures, also delicately carved. No amount of writing can adequately describe the temple at Halebeedu. One has to visit it and see for himself. I strongly recommend a trip to Belur and Halebeedu to my brothers and sisters from JU who have not been there yet. They will find the time well spent. Details of the temples at Belur and Halebeedu have been taken from the Internet.

Image 4: Old Delhi offers great opportunities for street photography. I joined a group of photographers on a journey through the narrow streets of the old city. We started at about 7.30 AM at Hauz Qazi Metro Station. Early morning is the time when heavy loads are shifted in manually operated carts operated by two people. My Image No.4 shows one such cart with one man pulling and his partner pushing. It is a tough job and yet they do this every day for their daily bread. Try as I may, I cannot get this Image out of my mind. I keep thinking of the hard labour done by these men and wonder when they can be given facilities like small battery operated trucks which can be used in the tight spaces of Old Delhi. Introduction



of such vehicles will be helpful in stopping this kind of manual labour. The concerned authorities could start with a feasibility study of the options available.

Image 5: From Delhi we move south to “God’s own country” – beautiful Kerala! This state is justly famous for its soothing scenery, rolling green hills dotted with tea gardens and charming backwaters where one can stay in a houseboat and sail through the greenery. We chose to visit a small town called Munnar, nestling in the green hills amidst the terraced tea gardens. We stayed at a resort located at the highest point in Munnar. The view was breathtaking and we enjoyed our breakfast while taking in the idyllic surroundings. Perhaps you can share the view we got from the breakfast table and see the foggy mountains, a narrow hill road bordering a portion of a tea garden, and our table. This is our Image 5.



Image 6: The French left India long back and returned to France, but they left behind a number of thriving French colonies including Pondicherry (Puducherry), Karaikal, Mahe, Yanam, and Chandernagore (Chandannagar), which were officially transferred later to the Union of India in 1954 and 1962, leaving a lasting cultural legacy. We visited Pondicherry about 10 years ago and were charmed by the small town with a bustling “French” quarter which bore its own architectural style. Our Image 6 shows an old heritage building, now a hotel in the French style. This hotel, called the “Palais de Mahe”, is very popular among the tourists today. The building is coloured yellow, a typical shade of which is used in many old French



buildings in the city. This photo was taken just after sunset and the hotel presents a well-lighted, welcoming look. Anyone visiting Pondicherry might be tempted to try this hotel. We were told that their food is excellent.

Image 7: My seventh Image is of the Golden Fort of Jaisalmer, Rajathan. This fort has been immortalized by Late Shri Satyajit Ray in his film “Sonar Kella”, released in 1974. Jaisalmer Fort, built in 1156 AD by Rawal Jaisal on Trikuta Hill, is a UNESCO World Heritage Site and a prominent “living fort” in Rajasthan’s Thar Desert. Known as Sonar Kella (Golden Fort), it houses 3,500+ residents, incredible yellow sandstone architecture, intricate Jain temples, and the Fort Palace Museum. Constructed with yellow sandstone, it features a 5-meter tall base wall, 99 bastions, and four massive gateways, making it a masterpiece of defensive engineering. “Living Fort”: Unlike many deserted forts, Jaisalmer Fort contains homes, businesses, and restaurants, with roughly 4,000 residents still living within its walls. Jain Temples: A complex of seven stunning temples dating back to the 12th-15th centuries,





featuring complex, delicate carvings. Fort Palace Museum: A former palace showcasing royal artifacts, and offering panoramic views of the “Golden City” from its rooftops. History: The fort was a crucial stop for trade caravans (including the Silk Road). It witnessed several battles, including a severe attack by Alauddin Khilji in the 13th century. There are several shops where local items are sold. Rajasthani pugrees are very popular with tourists, especially among the foreign ones. The local architecture can be seen in many old Havelis which are present in the Fort. This fort has many unique features and is definitely worth a visit. For visiting desert areas, a good time is October to March, when the weather is relatively cool.

Image 8: Playful swans are shown in this image, taken at the Westin Sohna Resort and Spa, a beautiful property on Sohna Road in Gurgaon. We had stayed there once during Diwali to escape the pollution in the capital and had a very pleasant experience there. We found they had some activity for every age group. There were a



couple of lakes on their 33 acre property where they could arrange fishing for enthusiasts. They also have some animals like emus, horses (special escorted rides for children) and beautiful swans either swimming in the lake or roaming around the spacious grounds. My Image presents a group of swans socializing on the grounds. The group looked so pretty that I just had to take a photo. Hope you like them too.

Image 9: Waah! Taj is a photo of the world famous Taj Mahal, taken just after sunrise. It was around 6.15 AM and you can see other photographers even at this early hour. The Taj is probably the most photographed monument in India and I will not spend time or space in describing the beautiful structure. I hope everyone will enjoy feasting their eyes on this “teardrop on the cheek of time”, as Rabindranath Tagore described it in his famous poem on the Taj.



NOTE: Various details about different images mentioned above have been taken from the Internet.

ফিরে দেখা

মৈত্র্যেয়ী মিত্র

(এম.এ. বাংলা, ১৯৬২)

পাঁচশি বছরের দীর্ঘজীবনে অনেক স্মৃতি অনেক বলার কথা থাকে। কিন্তু সে স্মৃতিচারণের জায়গা এটা নয়। ছাত্রজীবনের কিছু সময় হস্টেলে কেটেছে। তারই একটা ছবি। স্কুল জীবনের প্রথম দিকের পড়াশুনো বাড়িতে থেকে। মাধ্যমিকের পরে হোস্টেলে শুরু। প্রথমেই শান্তিনিকেতন। পরে কলকাতা। আমি যে মফঃস্বল শহরে থাকতাম সেখানে বাড়ির মেয়েরা একা একা বাইরে যেত না। দু পায়ে দূরে স্কুল। তবু ঠাকুর মশাই (ব্রাহ্মণ পাচক, যিনি আরো দুজন সহায়কের সঙ্গে বাড়িতেই থাকতেন) সঙ্গে যেতেন।

এই পরিবেশ থেকে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত খোলা মেলা পরিবেশে। ছেলে-মেয়ের অবাধে মেলামেশা, আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়ে সকলে মিলে গান গাইতে গাইতে পূর্ণিমা রাতে হাঁটা, সিংহসদনে ঘন্টাতলায় বসে আড্ডা, গাছতলায় বসে ক্লাশ করা, সুযোগ পেলেই লাইব্রেরিতে গিয়ে সময় কাটানো, দলবেঁধে চার-বার কিচেনে খেতে যাওয়া। রাত্রে শ্রীসদনে ইচ্ছেমত গল্প ইত্যাদি।

সেই সময় শান্তিনিকেতন বি.এ. অনার্সে এক বছর বেশি লাগত। অভিভাবকরা সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতায় থেকে পড়ার।

নিশ্চিন্ত নিরাপদ থাকার জায়গা লেডি ব্রোবোর্ন কলেজের হস্টেল। রমা চৌধুরী মহাশয়া তখন সেখানে অধ্যক্ষা। শিক্ষা জগতে কলেজটির একটি বিশেষ স্থান। অতএব এখানেই ভর্তি। হাতে গোনা সিট হলেও হোস্টেলেও জায়গা পেয়ে গেলাম।

বিশুদ্ধ কঠোর বন্দীজীবন যাত্রা শুরু হল। হয়তো

শান্তিনিকেতন থেকে আসার ফলেই বেশি বদ্ধ পরিবেশ মনে হত। মেন গেট ছাড়াও কলেজের পাশের দিকে একটি গলিতে আর একটি ছোট গেট। সেখানেও আর একটি দারোয়ান। পার্কসার্কাস ময়দানের কোণে ডনবস্কোর পাশে, চার-পাঁচ তলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে একস্টনশন হোস্টেল চলত। নতুন কিছু মেয়ের প্রথম বছরের পুরোটাই বা কিছুটা সময় ওখানে কাটাতে হত।

সেখানে যেসময় বেচারী মেয়েরা থাকত তাদের সকালে দারোয়ানের সঙ্গে দলবেঁধে কলেজে চলে আসতে হত ও কলেজ ছুটি হলে তারপর আবার নিজেদের বাসস্থানে ফিরত। শেষের পিরিয়ডগুলিতে কোনো ক্লাশ না থাকলেও এর থেকে মুক্তি ছিল না।

আমাদের সহপাঠিনি কেউ কেউ বোরখা পরে কলেজে আসত। বেশির ভাগই বাড়ির গাড়িতে। ছাত্রীদের কমনরুমের পাশে একটা ঘর। সেখানে এসে ওরা সারাদিনের মতো বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশে যেত।

ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে না হলেও পার্ক সার্কাস থেকে গড়িয়াহাট কিবা দূর। কিন্তু সেখানে যেতে হলেও হোস্টেল সুপারের অনুমতি নিতে হত। সঙ্গে থাকত দারোয়ান। ৮/১০টি মেয়ের দল। তার নেতৃত্বাধীনে একটু ঘুরে ফিরে চলে আসা।

রবিবার যাঁর নাম নথিভুক্ত সেরকম একজন কেউ দেখা করতে আসতে পারতেন। কিন্তু সেই ঘরেও সুখাদির নজর থাকত।

অবশ্য অতদিন আগেও খাবার ব্যবস্থা ভালো ছিল। ছোট ছোট টেবিল ছয় থেকে আট জনের বসার ব্যবস্থা। টেবিলে ডিনার সেটে খাবার দিয়ে দেওয়া হত। আমরা নিজেরাই ইচ্ছেমত নিতাম।

বি.এ. পরীক্ষার পরেই বিয়ে করে ফেলি। গড়িয়াহাটে থাকা শুরু। সেখান থেকে যাদবপুরে এম.এ. পড়তে যাওয়া। তখনো ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ হয়নি। কোন সময় কতটা সময়ের জন্য রাস্তা বন্ধ হবে জানা ছিল। সেই হিসেবে বেরোনো। অবশ্য মালগাড়ির জন্য ব্যতিক্রম হত। তখন অসুবিধা।

যাদবপুরে আমরা ঝিলের এপারের। তাই ঝিলের অন্যপারে যারা তাদের সঙ্গে সেভাবে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠেনি। অবশ্য ওরা-আমরা মনোভাবও ছিল না। ক্লাশ এদিকে

করলেও মাঝেসাঝেই মেন বিল্ডিং-এ যেতাম।

ব্রেবোর্ন থেকে এসে যাদবপুরে আবার অন্য রকম। ক্লাসে ছেলে-মেয়ে সব একসঙ্গে। বিবাহিত বলে যে আলাদা ভাবে দেখা হত তাও নয়। তবু হয়তো অন্যরা যেমন খুশি থেকে যেত। আমার একটা বাড়ি ফেরার তাড়া থাকত। থাকত কি? ফিরেও তো একা!

কখনো বা দলবেঁধে কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে আড্ডাও দিতে গেলি। ফার্ন রোডে গড়িয়াহাটের মোড়ে বাড়ি হবার সুবাদে বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় খুব অতিথি সমাগম হত। আর অফুরন্ত আড্ডা। পরে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একটা জায়গাও নাম করে নিয়েছিলেন।

আরো কত কথা লেখার আছে। কিন্তু কোথাও তো থামতেই হবে।



ফোটোগ্রাফি: অনুপ কুমার দাস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্রমবিবর্তনের গল্প

বিজন কুমার সিংহ

(EE, ১৯৮২)

কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়-এটি এক ইতিহাস, এক আন্দোলনের ফসল, এক স্বপ্নের বাস্তব রূপ। আর সেই স্বপ্নের ভিতরেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ - যার বিবর্তন এক রোমাঞ্চকর গল্পের মতো।

সূচনা: জাতীয় শিক্ষার বীজ (১৯০৫—১৯২০)

গল্পের শুরুটা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনা জেগে উঠছে। এই সময়েই জন্ম নেয় ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন’ - একটি স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস। সেই আন্দোলনেরই ফল ছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। প্রথমদিকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আলাদা বিভাগ হিসেবে ছিল না। বরং মেকানিক্যাল ও জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে বিদ্যুতের প্রাথমিক ধারণা শেখানো হত। তখন বিদ্যুৎ ছিল এক নতুন বিষয় - রাস্তার আলো, টেলিগ্রাফ, ট্রাম - সবকিছুই মানুষকে মুগ্ধ করছিল।

বিকাশের প্রথম ধাপ (১৯২০—১৯৪৭)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। কারখানা, রেল, বিদ্যুৎ - সব ক্ষেত্রেই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি আলাদা শাখা হিসেবে গুরুত্ব পেতে

শুরু করে। ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরি তৈরি হয়, নতুন শিক্ষক যোগ দেন, এবং পাঠ্যক্রম আরও আধুনিক হয়। ছাত্ররা শুধু বই নয়, হাতে-কলমে কাজ শিখতে শুরু করে। এই সময়ের ছাত্রদের কাছে বিদ্যুৎ ছিল যেন এক জাদু-তারা ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, সার্কিট-এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত, আর স্বপ্ন দেখত এক আধুনিক ভারতের।

স্বাধীনতার পর নতুন দিগন্ত (১৯৪৭—১৯৬০)

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ-নিজেদের শিল্প ও অবকাঠামো গড়ে তোলা। এই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় (১৯৫৫ সালে)। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সূচনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম। ১৯০৬ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (NCE), বেঙ্গল এই বিভাগের সূচনা। এই বিভাগের সূচনার জন্য যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন প্রফেসর হেমচন্দ্র গুপ্ত, প্রফেসর হীরালাল রায়, ও প্রফেসর সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। বিভাগটিকে আরও উন্নত মানের করার জন্য প্রফেসর হেমচন্দ্র গুহ এবং ড. ত্রিগুণা সেনের অবদান অনস্বীকার্য। ডক্টর সেনের ব্যাপারে কিছু বলার নেই। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ও ড. সেনের নাম সমার্থক। প্রফেসর গুহ সম্পর্কে সকলে অবগত আছেন কি না জানি না, তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক এবং



সম্প্রতি ২০২৫-২৬

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয় পাওয়ার সিস্টেম, মেশিন, কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি আধুনিক বিষয়। নতুন গবেষণাগার তৈরি হয়, এবং শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে শুরু করে। ছাত্ররা তখন শুধু চাকরির জন্য নয় - দেশ গড়ার জন্য পড়াশোনা করত।

আধুনিকীকরণ ও গবেষণার যুগ (১৯৬০—১৯৯০)

এই সময়টাকে বলা যায় বিভাগের সোনালি যুগের সূচনা। প্রযুক্তি দ্রুত বদলাচ্ছিল-ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, অটোমেশন-সবকিছুই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছিল। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও পিছিয়ে থাকেনি। নতুন কোর্স চালু হয়। গবেষণার সুযোগ বাড়ে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুরু হয়। এই সময় অনেক মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষক দেশ-বিদেশে নাম করতে শুরু করেন। বিভাগটি শুধু শিক্ষাদানেই নয়, গবেষণাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। ল্যাবরেটরিগুলোতে তখন দিন-রাত কাজ চলত-কেউ পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে কাজ করছে, কেউ সিগন্যাল প্রসেসিং, কেউ বা কন্ট্রোল থিওরি।

তথ্যপ্রযুক্তির আগমন (১৯৯০—২০১০)

১৯৯০-এর দশকে বিশ্বে আইটি বিপ্লব শুরু হয়। কম্পিউটার ও সফটওয়্যার প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগে যাদবপুরের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগেও। পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়: ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও মাইক্রোপ্রসেসর। ছাত্ররা শুধু

ইলেকট্রিক্যাল নয়, সফটওয়্যার ও আইটি ক্ষেত্রেও দক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে বড় বড় কোম্পানি আসতে শুরু করে। এই সময় বিভাগের পরিচিতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান যুগ: উদ্ভাবন ও বিশ্বমুখী দৃষ্টি (২০১০—বর্তমান)

আজকের দিনে যাদবপুরের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এক আধুনিক, গতিশীল এবং গবেষণামুখী কেন্দ্র। এখনকার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হল: রিনিউএবল এনার্জি, স্মার্ট গ্রিড, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স। ছাত্ররা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-তারা স্টার্টআপ করছে, গবেষণা প্রকাশ করছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। শিক্ষকরা বিশ্বমানের গবেষণা করছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করছেন।

গল্পের শেষ নয়, নতুন শুরু

এই বিভাগের ইতিহাস শুধু একটি বিভাগের বিবর্তন নয়-এটি এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে জ্ঞান, সংগ্রাম, এবং উদ্ভাবনের গল্প। একসময় যেখানে বিদ্যুৎ ছিল বিস্ময়, আজ সেখানে ছাত্ররা ভবিষ্যতের প্রযুক্তি তৈরি করছে। একসময় যেখানে ছিল স্বদেশি আন্দোলনের স্বপ্ন, আজ সেখানে বিশ্বমানের গবেষণার বাস্তবতা। এই গল্পের শেষ নেই-কারণ প্রতিটি নতুন ছাত্র, প্রতিটি নতুন গবেষণা, এই ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করে চলেছে। হয়তো আজকের কোনো ছাত্রই আগামী দিনের প্রযুক্তির পথপ্রদর্শক হবে-আর সেই গল্পও একদিন এই ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠবে।

PLEDGE FOR ORGANS & TISSUES

Give the *Gift of Life* to Someone in Need



SCAN THE QR CODE TO PLEDGE

or visit: www.notto.abdm.gov.in



SAVE LIVES



GIVE HOPE



SHARE LIFE



BE A HERO

#OrganDonation



আন্ধোরভাটের আনাচেকানাচে

লেখা : সুদেষ্ণা দাশ

(Biochemical Engineering, 2004)

ছবি : অর্ণব মুখার্জী

(Biochemical Engineering, 2004)

ইতিহাসের বিস্ময় পাশে নিয়ে বসবাস করেও যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে কাম্বোডিয়ার মানুষজনের মুগ্ধ হওয়ার অবসর। অথচ আন্ধোরভাটের দেশের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে তার মানুষের জীবন ও যাপনের গল্পে।



আমি বড় হয়েছি দেশভাগের গল্প শুনে! সেই থেকেই বোধ হয় এক দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরেক দেশের দিকে হেঁটে চলা একদল মানুষের গল্প মাথার মধ্যে চলমান দৃশ্যপট হয়ে গেঁথে গিয়েছে। থাইল্যান্ডের সীমানায় অরণ্যপ্রথেট (Aranyaprathet) পেরিয়ে কাম্বোডিয়ার পয়পেটের দিকে দীর্ঘ হেঁটে চলার ফাঁকে আশ্চর্যভাবে ঢুকে গিয়েছিলাম সেই দৃশ্যপটের গল্পটায়। অথচ তখনও জানতাম না সে দেশের মানুষদের জীবনযাপনের গল্প।

চলার শুরু...

পয়পেট অভিমুখে চলার শুরু টিনের ঘেরাটপে ঢাকা সরু একফালি ফুটপাথ ধরে, তার একধারে সারিসারি দোকান - বাসনপত্র, জামাকাপড়, ব্যাগ, ছাতা, টুপি, আরও কত কী। ঠিক যেন কলকাতার চাঁদনি মার্কেট। শতাব্দীপ্রাচীন এই বাজার এক সময় ছিল পরিব্রাজকদের চিন থেকে থাইল্যান্ডের আয়ুথায় (Ayutthaya) পৌঁছানোর পথে বিশ্রামস্থল। সাতের দশকে কাম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়

‘কিলিং ফিল্ড’-এর গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য দলেদলে মানুষ আশ্রয় নিত এর আশপাশে। আবার বহুদিন ধরে এই বাজারেই চলছে রেআইনি পণ্যের কেনা বেচা, এমনকী রন্যপ্রাণীর চোরাপাচার... খোঁজ করলে এখানে পাওয়া যাবে বাঘের নখ, ভালুকের থাবা, গন্ডারের শিং বা ধূসর টিয়া পাখিও। এইসব অনুষঙ্গ জুড়ে জুড়ে বাজার যেন এক স্মৃতির দেরাজ, এক-এক গলিতে এক-এক গল্পের কুঠুরি আর রয়েছে গেছে ডেউ খেলানো সোনালি ছাদ-দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চিরন্তন স্থাপত্যচিহ্ন।

বিশ্বের জুয়াড়ি মহলের এক অতীব পছন্দের গম্ভব্য এই পয়পেট। বিদেশি, বিশেষত থাই জুয়াড়িরা ভিড় জমায় পয়পেটের বিলাস বহুল ক্যাসিনোগুলিতে। তবে ‘কিংডম অফ কাম্বোডিয়া’র এই ‘স্পেশাল ক্যাসিনো জোন’ সে দেশের মানুষজন, স্থানীয় ভাষায় খ্মের (Khmer) জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কাম্বোডিয়ার বেশিরভাগ জনপ্রিয় আকর্ষণবিন্দু ঘিরে এই সীমাবদ্ধতার পুনরাবৃত্তিই খ্মের জীবনের দিকনির্দেশ করে। এ যেন বাড়ির উঠানে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, অথচ তাদের মুক্তি হওয়ার অধিকার বা অবসর নেই! আমাদের খ্মের গাইড ব্রেমের ভাষায় ‘আমরা প্রতিদিন সকালে কাজে বেরোই আজকের খাবারের চিন্তা মাথায় নিয়ে। তার বাইরে কিছু ভাবার মতো অবস্থায় এখনও আমবা পৌঁছইনি।’

স্মৃতির কুহক

একটি দেশ - একাধারে ‘আঙ্কোরভাট’ (Angkor Wat), ‘আঙ্কোরথম’ (Angkor Thom), ‘বায়ন’ (Bayon) ও অন্যান্য মন্দিরগুলি ঘিরে ইউনেসকো (UNESCO) ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, আবার ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা বা কুখ্যাত ‘কিলিং ফিল্ড’ এ ‘খ্মের রুজ (Khmer Rouge) বাহিনীর প্রায় কুড়ি লাখ গণহত্যার পরেও টিকে থাকার ইতিহাস, সবমিলিয়ে তৈরি করে মন্ত্রমুগ্ধকর বিষ্ময় আর ভালোলাগা। সে ভালোলাগার রেশ ব্যাপ্ত হয় ভোরের সিঁদুরে আলোয় স্নাত, পূর্বমুখী ‘বায়ন’ (Bayon) মন্দিরে মূর্তি তোরণের আশেপাশে। কত শতাব্দীর গল্প ‘সিঙ্ক রুট’ ধরে রয়ে এসে জমে থাকে মন্দিরের অলিন্দে। মন্দির সংলগ্ন গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষে কোনও এক বিষন্নতম সিঁড়ির ল্যাভিঙয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’ এই অনন্তে মিশে যাবার জন্যে।

শতাব্দীপ্রাচীন মহীরুহের শিকড় দিয়ে ঘেরা ‘তা ফ্রম’



(Ta From) এর কোনও এক ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে উঁকি মারে অবগুপ্তিতা নারী মূর্তি, শিকড়ের জালে ঢেকে গিয়েছে মুখের এক পাশ আর সেখানেই পুঞ্জীভূত রহস্য

পুনরুদ্ধারের কাজ চলছিল পুরোদমে বিভিন্ন দেশের সহায়তায়। বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য! সেখানেই আলাপ হল গুরুগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার রোহিত শর্মার সঙ্গে। সাত বছর ধরে কাজ করছেন আঙ্কোরের বিভিন্ন মন্দির চত্বরে। সাক্ষী ইতিহাসের উন্মোচনের... কিন্তু দিন গুনছিলেন দেশে ফেরার। ফেরা অতীত থেকে বর্তমানে - সঙ্গে থাকে স্মৃতি! মন্দির দেওয়ালের ফাটল, প্রতিধ্বনিময় অনাড়ম্বর গর্ভগৃহের কোণে রয়ে গিয়েছে সেইসব স্মৃতিচিহ্ন, অমোঘ কালচিহ্নের মতো।

মন্দিরের অলিন্দে

কাম্বোডিয়ার অন্যতম আকর্ষণ - আঙ্কোরভাট- খ্মের ভাষায় মন্দির নগরী, যার উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ ‘নগর’ থেকে। সেই স্কুলের ইতিহাস বইয়ে পড়া ‘বিশ্বের সর্ববৃহৎ মন্দির’- হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তিন ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের এক আশ্চর্য মেলরন্ধন, আবার বাস্তবত্বের প্রতীকও বটে। তিন ধর্ম মতের সৃষ্টিতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু কাল্পনিক সুমেরু পর্বতের আদলে তৈরি এই বিষ্ণুমন্দির পশ্চিমমুখী। হিন্দু পুবাণমতে এই দিকনির্দেশ মৃত্যুর প্রতীক। এমনকী দেয়ালের ভাস্কর্যের সারিও বাম অভিমুখী। এ কী বিষ্ণুর বামাবর্তী শঙ্খের



প্রতিরূপ? নাকি মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের রহস্যময় সমাধিস্থলের প্রতীক?

এইসব প্রশ্নে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে হেঁটে চলেছিলাম মন্দিরের চারধারের পরিখার উপর দিয়ে তৈরি পাথুরে রাস্তা ধরে, পেরোলাম মূল প্রবেশদ্বার, তারপর প্রশস্ত চাতাল আর অবশেষে দীর্ঘ সিঁড়ি রেয়ে মূল তোরণ। এ যেন হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখিত চার যুগ আর জীবনের চার অধ্যায়ের এক সমান্তরাল যাত্রা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির মূলে অথবা মহাবিশ্বে বিলীন হওয়ার এক রূপক।

মন্দিরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রতীকী ভাস্কর্য... ‘সপ্তমুখী নাগ’, নৃত্যরত অঙ্গরা, শিব ও শক্তিচিহ্ন আর স্থানীয় জনজীবনের দৃশ্যাবলী গড়ে তোলে এক সহজিয়া সাক্ষ্যধর্মের প্রতিরূপ! ঠিক যেন ধর্ম সংস্কারক বাজা সূর্যবর্মণের রহস্যময় অথচ সহজ ধর্মাচরণের ছবি - শৈব, বৈষ্ণব আর বৌদ্ধ ধর্মের এক সহাবস্থান। তাই গোধুলির আলোআঁধারিতে আন্ধোরের সিলুয়েট মনে পড়ায় সঙ্ক্ষিপ্তের পদাবলী, চর্যাপদের সাক্ষ্যভাষা, প্রান্তিক অথচ আদি অন্তহীন রহস্যময়তা। এই আদি অন্তহীনতাই যেন আন্ধোরের ভরকেন্দ্র- এক চিরকালীন কুহক।

সেই কুহক ঘিরে আছে অন্যান্য মন্দিরগুলিকেও... তাই গড়ে ওঠে ছোট গল্পের মতো স্মৃতিচিত্র! নির্জন সন্ধ্যায় প্রেয়া খান (Prea Khan)-এর চাতালে বসে ছবি এঁকে চলে স্থানীয় পটুয়া। রাইস পেপার উপর টেম্পল রাবিংয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় চরিত্র গুলির মুখের আদল, দেহের ভঙ্গিমা, সূক্ষ্ম কেশবিন্যাস, চীনাংশুকের ভাঁজ, তৈরি হয় মহাকাব্যের পরিচয়! হয়তো আমাদের কোনার্ক বা খাজুরাহোর দেয়ালের ভাস্কর্যের মতোই, তবুও যেন স্থান কাল ভেদে এই কাব্যের পাত্র পাত্রী একটু ভিন্ন।

বাঙ মিলিয়া (Bang Melea) মন্দিরের চারি ধরে শুকনো পরিখায় জমে থাকা পাতার স্তূপে ঝাড়ু লাগায় যে অর্ধশতাব্দী পেরনো লোকটি, তার ছোট রেডিয়েতে

রেজে চলে গান... সে গানের শব্দ অচেনা হলেও তার চেনা চেনা সুর বাতাসে পাক খেয়ে ফেরে। সেই সুরে ভর দিয়ে ভেঙ্গে যায় পাতার স্তূপে জমে থাকা স্মৃতির আকরিক, অশ্রুত গানের মতো।

বানতেই-স্ট্রেই (Banteay Strei) মন্দিরের গোলাপি বেলে পাথরের দেওয়ালে সূক্ষ্ম পৌরাণিক ভাস্কর্যের অপরূপ প্রতিচ্ছবি স্থির হয়ে থাকে পাশের তরঙ্গহীন পুকুরের বুকে। ভাঙা তোরণদ্বারের পিছনের চাতালে বিশাল গাছের ছায়ায় ঘেরা শিব ও শক্তি চিহ্ন আর চতুর্ভুজে আবদ্ধ অগম্য গর্ভগৃহ সব মিলেমিশে এক অনন্য উপস্থিতি, ঠিক যেন খাজুরাহোর পার্বতী মূর্তি, নন্দ অথচ তীব্র ইশারাময়, গম্ভীর অথচ আকর্ষক।

জীবন ও যাপন

এইসব অরণ্যবেষ্টিত প্রাচীন মন্দিরগুলোতে প্রতিবেশী শহর সিয়েম রিপ (Siem Reap), এক জনারণ্য, আবার যুদ্ধোত্তর নাগরিক কাঙ্ক্ষোড়িয়ার গড়ে ওঠার গতিময় উদাহরণও রটে। এই শহরের প্রাণবায়ু পুরানো টাউন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সমনামী নদীটি। নদীর তীরে ফরাসি উপনিবেশের অনুসঙ্গে গড়ে ওঠা ইউরোপিয়ান স্থাপত্য রীতির বাতিঘর, বুক ক্যাফে, আর্ট গ্যালারি, ম্যাসাজ পার্লার বা বর্গিল ‘পাব স্ট্রীট’ অনায়াসেই তৈরি করে এক কসমাপোলিটান চরিত্র। ম্যাজিকের মতো গড়ে ওঠে এক উৎসব সদৃশ উপস্থিতি। কিন্তু এই উদযাপনের চলচ্চিত্রে খেমর জনগণের অংশগ্রহণ শুধুই জীবিকার তাগিদে।

কখনও বা টুকটুক চালক, বড় রেস্টুরার কর্মচারী, সাপভাজা, ব্যাঙভাজা, ডিমে আঁচে মৃদু পোড়ানো সুন্দার হাঁসের মাংস আর কোয়েলের ডিমের ফেরিওয়ালা; ‘অ্যান্টিক শপের’ ছিপছিপে হাস্যমুখী বিক্রেতা কিংবা ম্যাসাজ পার্লার এর অক্লান্ত সেবিকা, চরিত্রগুলি আলাদা, তবে ভূমিকা একই! পর্যটকদের জন্য নিরলস সেবার আয়োজন। তাই খেমরদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ছবি খুঁজতে হলে ঘুরে আসতে হবে শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে! ঠিক যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ মিষ্টি জলের হ্রদ, টন-লে-স্যাপ (Ton Le Sap) ঘিরে গড়ে ওঠা জেলেদের গ্রাম ক্যামপং ফলুক (Kompong Phluk) সিয়েম রিপ থেকে প্রায় আঘঘন্টা গাড়ির পথ পেরনোর পর বাকি যাত্রাপথের একমাত্র ভরসা জেলেদের মোটর বোট। সরু নদীর একবার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ছোট গ্রাম। লম্বা গাছের গুঁড়ির মাচানের উপর রঙিন কাঠের বাড়ি- কমলা, নীল, গোলাপি, সবুজ। মাচানের উপর

দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলি যেন লম্বা রণপা চড়ে প্রস্তুত সব ঝড়ঝাপটা আর বন্যার মোকাবিলায়। প্রতিবাড়ির সামনে ঘাটে বাঁধা রয়েছে একটি করে নৌকো... ঠিক যেন ‘নদীর ধারে বাড়িটি থাকবে চৌকো, থাকবে একটি শ্যাওলা রাঙানো নৌকো’



এই গ্রামের জীবনধারা ওই জলশ্রোতের সঙ্গে এক তারে বাঁধা। তাই দুপুরের খোশ গল্প থেকে শুরু করে আনাজপাতি বাজার আর দৈনন্দিন ঘর গেরস্থালির খুঁটিনাটি নৌকোর পাটাতনে জলের উপর! এই গ্রামের মেয়েরা ভারী ছটফটে আর সপ্রতিভ। আলাপ হল স্থানীয় মেয়ে সুবর্ণার মায়ের সঙ্গে। চল্লিশের দোরগোড়ায় পৌঁছানো ছেটিখাটো পুতুলের মতো মানুষটি ফেরি করেন স্কুলের বইপত্র। লাভের একটা অংশ বরাদ্দ স্থানীয় স্কুলের উন্নতি তহবিলে। এরকম আরও অনেকের ছোট বড় সাহায্য মিলিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রামের বৌদ্ধ উপাসনালয়, স্কুল, রস্তোঘাট। এরা প্রবলভাবে সামাজিক আর সেটাই বোধহয় এদের বেঁচে থাকার মূল রসদ। তাই মেকং-এর জল টন লে স্যাপ উপচে গ্রাম ভাসানোর পরেও এরা আবার ঘর বাঁধে। সুবর্ণার বাবার মতো অনেকেই টন লে স্যাপে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরে না। তবুও থেমে যায় না সুবর্ণার মায়ের অদমা প্রাণশক্তি। মনে পড়ে যায়, ওই গ্রামে শেষ বিকেলের আলোয় দেখা এক সুন্দরী কিশোরীর আসন্ন মাতৃত্বের গর্বে দৃপ্ত মুখটি... যে দীপ্তি স্নান হয় না অনাগত ভবিষ্যতের চরম অনিশ্চয়তাতেও।

এই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য কাম্বোডিয়ার ঘরে ঘরে... তাই গৃহযুদ্ধের সময় পরিবার পরিজন হারানো ব্রেম ঘর বেঁধেছেন

তারই মতো আরেক সব হারানো মানুষের সঙ্গে। ব্রেমের স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরক্ষর হলেও তাঁদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। আন্ধোরভাট চত্বরে স্মারক ফেরি করে ফেরা ছোট মেয়েটি স্কুলছুট নয়। সকালে স্কুলের পর প্রায় ১০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে তবে সে মন্দিরে পৌঁছয় কিছু রাজেগারের আশায়। ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে আহত অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে উপার্জনের লড়াই চালায়, সুর বাঁধে, শোনায জীবনের গান। আবার ছোটবেলা থেকে ল্যান্ডমাইন পেতে চলা ‘আকিরা’ আজ নিরলসভাবে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে চলে। তার ল্যান্ডমাইন মিউজিয়াম ঘিরে গড়ে উঠছে এক বৃহৎ পরিবার- ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে বাবা মা হারানো বাচ্চাদের আশ্রয়স্থল।



সিয়েম রিপের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা আন্ধোর সিঙ্ক ফ্যাক্টরিতে কর্মরতা মেয়েরা আসে যুদ্ধবিন্দুস্ত পরিবারগুলো থেকে। অথচ সেই সূচীবিন্দু ব্যথা রোধ করে না তাদের সৃজনশীলতা। ঠিক যেন গুটিপোকাকার মতো নিজেকে নিজেকে ধীরে ধীরে উজাড় করে, অতি যত্নে বুনে তোলে জ্যামিতিক নকশা সোনালি রেশমের জমিতে। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে পর্যটকদের গল্প শোনাতে বলে - গুটিপোকাকার জীবনচক্রের গল্প, জীবন বুনে তোলার গল্প, যা লেখা আছে মালবেরি গাছের পাতায় পাতায়।

সে গল্পেরা বাতাসে পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে বানতে-স্ট্রেই-এর পাশের ধানক্ষেতে, উপচে পড়ে টন-লে- স্যাপের জলে। আন্ধোরভাটের দেশের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে এই গল্পগুলির মধ্যে। তাই আরো একবার যেতে ইচ্ছে করে কাম্বোডিয়া এ, সে দেশের মানুষের গল্পের টানে।

বাদামীতে কয়েকদিন

অনুপ কুমার দাস

(PhD, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ২০০৯)

আবার ফিরে এলাম বেড়ানোর খবর নিয়ে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম কর্ণাটকের বিভিন্ন পর্যটন স্থানে। কোভিড লকডাউন একটু শিথিল হওয়ার পরই। তার মধ্যে আমাদের প্রথম গন্তব্য বাদামী শহর। বাদামী ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেনে করে সহজেই যাওয়া যায়। আমরা যে ট্রেনে গিয়েছিলাম তা ভোরের আলোফোটোর আগেই বাদামী স্টেশনে পৌঁছে দিল। সেখানেই পেয়ে গেলাম একটি অটোরিকশা। সেটা করে পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেল, মৌর্য চালুক্যর। একটি সরকারী ছিমছাম হোটেল। এটিকে কেন্দ্র করে বাদামী, আইহোল ও পাট্টাডাকাল পর্যটকেরা বেড়িয়ে আসেন। তিনটিই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক শহর হিসাবে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে।

প্রথম দিন হোটеле চেক-ইন করে বেরিয়ে পড়লাম বাদামী প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, ভূতনাথ মন্দির ও উচ্চ ও নিম্ন শিবালয় মন্দির চত্বর দর্শন করতে।

বাদামী প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপিত হয় ১৯৭৯ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা এ.এস.আই. দ্বারা। এটিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে বাদামী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রত্নবস্তুর এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। চালুক্য যুগের, যার মধ্যে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর ভাস্কর্য, খোদাইকর্ম এবং চিত্রকর্ম এটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাদুঘরটি সুশৃঙ্খলভাবে বেশ কয়েকটি গ্যালারি ও স্থানে বিভক্ত, যার প্রতিটিতেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে।

প্রথম গ্যালারির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি মকর-তোরণ। এটি মূলত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকের চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। তোরণটির দুই প্রান্তে রয়েছে পৌরাণিক জলচর প্রাণী ‘মকর’

(কুমিরের মতো দেখতে) এর মুখ, যেটি মনোরম নকশাচিত। এই গ্যালারিতে আরো রয়েছে ভাগবত বেলোপাথরের তিনটি দীর্ঘ খণ্ড, যেগুলিতে ভগবান কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন পর্বের আখ্যান খোদাই করা হয়েছে। এগুলিতে রাজা কংসের কৃষ্ণকে হত্যা করার প্রচেষ্টা এবং সেই মহাকাব্যিক মল্লযুদ্ধ চিত্রিত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত কংসের পরাজয়ে সমাপ্ত হয়। শিব ভাস্কর্য: এই গ্যালারির উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরাস্তক-শিব (ত্রিপুরাসুর ধ্বংসকারী শিব) এবং মার্কণ্ডেয় অনুগ্রহ-মূর্তি (মৃত্যুর দেবতা যমের হাত থেকে তাঁর নিঃসন্তান ভক্ত মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করার জন্য শিবের লিঙ্গ থেকে আবির্ভাব)।

দ্বিতীয় গ্যালারিতে রয়েছে উর্বরতার দেবী লজ্জা-গৌরী এবং অন্যান্য দেবদেবীগণ। এই গ্যালারির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি হল উর্বরতা ও বংশ রক্ষার দেবী লজ্জা-গৌরীর প্রায় জীবন্ত আকারের একটি ভাস্কর্য। তাঁকে এক অনন্য ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে তাঁর মাথার জায়গায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম রয়েছে। হিন্দু পুরাণমতে পদ্মফুল উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্যালারিটিতে শিব ও পার্বতীর উগ্র রূপ, যেমন ভৈরব, ভৈরবী এবং চামুণ্ডীর ভাস্কর্যের পাশাপাশি হরিহর (শিব ও বিষ্ণুর সম্মিলিত রূপ), বীরভদ্র এবং গণেশের মতো দেবতাদেরও ভাস্কর্য রয়েছে। অন্যান্য গ্যালারিতেও ছিল চোখে পড়ার মতো চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্যের অনন্য শিল্পনৈপুণ্য, যা কর্ণাটক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ভূতনাথ মন্দির : অগস্ত্যতীর্থ জলাধারের ধাপে ধাপে সাজানো তীরের ঠিক উপরে অবস্থিত এই মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য স্থাপত্যের পরিণত পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল। এটিকে দেখে জয়পুরের জলমহলের কথা মনে



অগস্ত্যতীর্থ জলাধারের মাঝে ভূতনাথ মন্দির

পড়ে যায়। তিনদিকেই প্রায় বৃত্তিত পাহাড়। তিন দিক থেকে জলবেষ্টিত হওয়ায়, বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময় এখান থেকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। আমরাও এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করলাম।

উচ্চ ও নিম্ন শিবালয় মন্দির : এই প্রভাবশালী স্থাপত্য মন্দিরগুলি উত্তর দুর্গ পাহাড়ের উঁচু স্থানে অবস্থিত। নিকটবর্তী মালেগিড়ি চালুক্য দ্রাবিড় শৈলীতে নির্মিত একটি বিশিষ্ট মন্দির শিবালয়ও এই উত্তরের পাহাড়ে অবস্থিত। জাদুঘরের উপরের দিকের রাস্তা দিয়ে এই মন্দির দুটিতে পৌঁছানো যায়। বেশ খাড়া পাহাড়, বেশ কিছুটা ট্রেকিং করে আমরা মন্দির চত্বরে পৌঁছালাম। উপর থেকে বাদামী শহরের জনবসতি ও বাদামী গুহা প্রাঙ্গণের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সুন্দর ভাবে উপভোগ করা যায়।

বাদামী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান : দ্বিতীয় দিনে আমরা পৌঁছে যাই বাদামী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অর্থাৎ মূল গুহা প্রাঙ্গণে। খুব সকালবেলায় আমরা প্রাতরাশ করে বেরিয়ে পড়ি। টিকিট সংগ্রহ করে, সঙ্গে একজন স্থানীয় গাইড নিয়ে আমরা দেখতে শুরু করলাম বাদামীর প্রত্নতাত্ত্বিক গুহা প্রাঙ্গণ। বাদামী সম্বন্ধে কিছু তথ্য এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হল, যা পেয়েছি আমাদের গাইড ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI)এর বিভিন্ন ফলক থেকে।



উচ্চ শিবালয় মন্দির

বাদামী, যা প্রাচীনকালে মূলত বাটাপি নামে পরিচিত ছিল, ৫৪৩ থেকে ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি চালুক্য রাজবংশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য এবং মহিমাযুক্ত বেলেপাথরের পাহাড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চালুক্য সম্রাট প্রথম পুলকেশী (৫৪৩-৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শহরের প্রতিরক্ষার জন্য অবিলম্বে দুর্গ নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক প্রকৌশলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল ইংরেজি ‘U’ আকৃতির উপত্যকা জুড়ে অগস্ত্যতীর্থ বাঁধ তৈরি করে একটি সোপানযুক্ত জলাধার নির্মাণ। অগস্ত্যতীর্থ জলাধার, যা নতুন রাজধানীর জন্য একটি স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য জলের উৎস হিসেবে কাজ করত। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাদামী স্থাপত্য উদ্ভাবনের এক সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। চালুক্যরা দক্ষিণ পাহাড়ে চারটি চমৎকার শিলা-খোদিত গুহা মন্দির এবং উত্তর পাহাড়ে কাঠামোগত পাথরের মন্দির নির্মাণ করেছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬১০-৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকালে সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছিল, যিনি উত্তর ভারতে রাজা হর্ষবর্ধন এবং তামিলনাড়ুতে পল্লব রাজাদের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তবে, এই সম্প্রসারণ তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছিল। পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে, পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহবর্মণ ৬৪২ থেকে ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাদামী আক্রমণ করে দখল করে নেন। চালুক্যরা ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে সফলভাবে তাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে, যা শিল্প ও স্থাপত্যের এক বিশাল পুনরুজ্জীবনের সূচনা করে। এই স্বর্ণযুগ প্রায় ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, যখন বাদামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। চালুক্যরা অবশেষে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের নব-উত্থিত শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে। যদিও বৃহত্তর চালুক্য ঐতিহ্য বিভিন্ন উত্তরাধিকারী রাজ্যের মাধ্যমে টিকে ছিল, কিন্তু বহিরাগত আক্রমণ এবং নতুন সাম্রাজ্যের উত্থানের কারণে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণাভ্যে তাদের আধিপত্যের অবসান ঘটে। খোদিত গুহাগুলির পাশাপাশি, চালুক্যরা উত্তর ভারতীয় (নাগর) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (দ্রাবিড়) শৈলীর সংমিশ্রণে কাঠামোগত স্বতন্ত্র মন্দির নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

বাদামীর গুরুত্বপূর্ণ গুহাগুলি: এই স্থানটি তার লাল বেলেপাথরে খোদাই করা গুহা মন্দিরগুলোর জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। এগুলো বিয়োজন নামক একটি কৌশল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স্থপতিরা সরাসরি

বৃহৎপাথরের মধ্যে খোদাই করে জটিল স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, প্রধান মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ তৈরি করেছেন। এখানে মূলতঃ পাঁচটি প্রধান গুহা রয়েছে যেগুলি পর্যটকদের জন্য খোলা আছে।

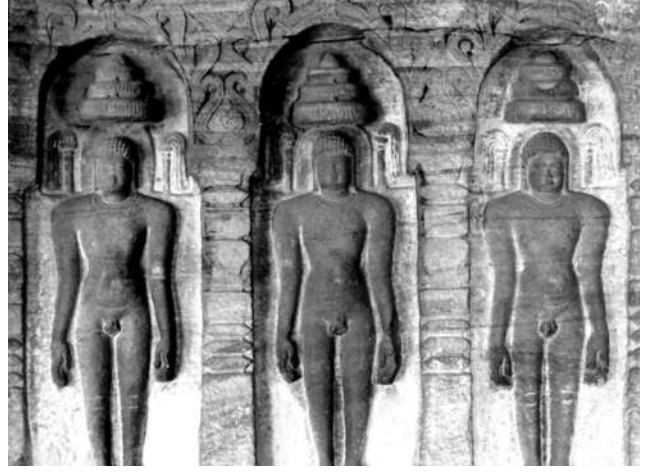
প্রথম গুহা: ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত এই গুহাটি ভগবান শিবকে উৎসর্গীকৃত। এটি অষ্টান্ন বাহুবিশিষ্ট নটরাজের (নৃত্যরত শিব) অত্যাশ্চর্য ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত, যেখানে তিনি ৮১টি স্বতন্ত্র ভরতনাট্যম মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। এই গুহায় হরিহর (অর্ধ-বিষ্ণু, অর্ধ-শিব মূর্তি) এবং অর্ধনারীশ্বর (অর্ধ-শিব, অর্ধ-পার্বতী)-এর মতো নিপুণ সংমিশ্রিত দেব-দেবীর মূর্তিও রয়েছে।

দ্বিতীয় গুহা: সিঁড়ি বেয়ে এখানে পৌঁছানো যায়, এই গুহাটি ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত। ভিতরে দর্শনার্থীরা বিষ্ণুর অবতার, বিশেষ করে বরাহ (শূকর) এবং ত্রিবিক্রম রূপের শক্তিশালী খোদাই করা মূর্তি দেখতে পান।

তৃতীয় গুহা: এটি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর ও বিশদ গুহা, যা ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত। এটিই একমাত্র গুহা যার একটি নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়, যা রাজপ্রতিনিধি রাজা মঙ্গলেশের ৫৭৮-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে চিহ্নিত। এই বিশাল হলঘরটি বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের, যেমন বামন (খর্বাকৃতির), উগ্র (আসহকলা), এবং অন্যান্য অবতারের, চমৎকার ও গভীর খোদাই করা



প্রথম গুহার স্থাপত্য — নটরাজ মূর্তি



জৈন স্থাপত্য

ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। নরসিংহ (ভয়ঙ্কর অর্ধ-মানব, অর্ধ-সিংহ), শেয়নাগের (সর্প) উপর শায়িত বিষ্ণু, এবং বরাহ অবতার।

চতুর্থ গুহা: জৈন ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বকারী এই গুহাটি হিন্দু গুহাগুলির অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল। এতে জৈন আধ্যাত্মিক নেতা মহাবীর (২৪তম তীর্থঙ্কর), বাহুবলী এবং সর্পচর্মের ছায়ায় পার্শ্বনাথের বিশদ খোদাইচিত্র রয়েছে। এই গুহা থেকে নীচের অগস্ত্যতীর্থ হ্রদের এক মনোরম ও নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যও দেখা যায়।

পঞ্চম গুহা (প্রাকৃতিক গুহা): অন্য গুহাগুলোর কাছে অবস্থিত এটি একটি প্রাকৃতিকভাবে গঠিত পাথরের গুহা, যা ধর্মীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। এতে হিন্দু দেবতা গণপতির একটি মূর্তির পাশে একটি অসম্পূর্ণ বৌদ্ধ বেদীর অবস্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক নথি থেকে আরও জানা যায় যে, বিষ্ণুর মন্দিরে রূপান্তরিত হওয়ার আগে এটি সম্ভবত মূলত একটি বৌদ্ধ গুহা হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান: এই স্থানটিতে আরও অনেক প্রাচীন স্থাপত্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে অবস্থিত দত্তাত্রেয় মন্দির এবং অগস্ত্যতীর্থ জলাশয়ের বাঁধের উপর বিশেষভাবে অবস্থিত রেণুকা ইয়েল্লান্না মন্দির। আমরা ঐতিহাসিক শহর আইহোল ও পাট্টাডাকাল গিয়েছিলাম তৃতীয় দিনে।

এই ছিল আমার প্রত্নশহর বাদামী ভ্রমণের বৃত্তান্ত। আপনারা যাঁরা মাইসোর বা বেঙ্গালুরু বেড়াতে যাচ্ছেন, সুযোগ পেলে বাদামী, আইহোল ও পাট্টাডাকালও ঘুরে আসুন।

চিত্রশিল্পী: ড. অনুপ কুমার দাস



ଅମ୍ପାତି ୨୦୨୧-୨୨

Simple Thoughts

Partha Sarathi Mandal

(Civil, 1969)

Heart beats with simple thoughts
Heart beats with the realms of the soul.
Heart beats with the rhythm of living culture
Heart beats with the dance of the society.
Heart beats with the traditional values
Heart beats with a plate of rice with mother's touch.
Heart beats with the love of mother
Heart beats when her fingers role down the hair.
A writer does not need to be novelistic.
A poet does not need to be poetic.
A lover does not need to be romantic.
A love-couple does not need to be faithful.
A politician does not need to be social reformer
He even does not need to be good orator.
A Public representative does not need to be shrewd
He does not need even to be a good performing leader.
A Scientist does not need to be inventor.
A researcher does not need to be his associates.
A teacher does not need to be pupil's educator.
A philosopher does not need to be philosophical.
Science is the infinite storage of knowledge
Its dynamic wisdom always waits to be explored.
Volunteers are ready to provide social service.
Others do not hesitate to receive the benefits.
Wife does not need to dominate the husband.
Husband does not need to be henpecked.
A ruler does not need to be honest.
A ruler does not need to be autocrat.
A ruler does not need to be fascist.
A political party does need to be ruler.
A bureaucrat does not need to refer to rules
Office does not need to follow the officers.
An industrialist need not be a capitalist.
A manufacturer need not be a businessman.

A beggar does not need to be a poor man.
A homeless man does not need to roam around.
A gardener does not need to be garden grower.
A plant does not need to bloom flowers.
A desert does not need to have an oasis.
An oasis does not need to be illusionary land.
A camel does not need to be the ship of the desert.
A nomad does not need to have sheep herds.
A journalist does not need to be a news reporter.
Books are not published for decorating only libraries.
Terrorist does not need to be political or antisocial.
A State terrorism does not need to be ideological.
A police-thief duo do not need to run for long
They need not play hide and seek with handcuff.
A murderer does not need to be a criminal.
A victim does not need to wipe tears.
A rapist does not need to be hid his crime
A women does not need to hide her shame.
A criminal does not need to be afraid of police.
A police does not need to be hands and gloves.
A police does not need to be dishonest.
Prison doors does not remain close ever.
A pious man does not need to be religious.
A sadhu does not need to preach honesty.
Rain drops do not need to flow down to rivers
The rivers donot need to meander in search of sea.
An animal does not need to be omnivorous.
A snake does not need to be poisonous.
A love guru does not need to be love advisor.
Couples always find their love partners.
Astrologer does not need to manipulate predictions.
The devotees always find their doubtful fortunes.
Heart beats with the simple thoughts
Heart beats with the meditative soul.



Pledge Organ Donation and Save Life

Donate Blood Save Life
Donate Blood for Heart Beats

Donate Organ for divine need
Donate Organ for the Society

Oceanus

Adwaita Biswas

(S/o, Srabani Biswas (Com.Lit. 2008))

Full of water, full of blue.
Full of colours, full of hue.
But what's in it?
I have no clue.

Maybe big creepy creatures.
May be prehistoric friends.
May be some surprise from past.
May be some magic like star-dust.

For centuries,
It has been a mystery to cheer.
Many big predators are there,
who will cause you a lot of fear.

Scuba divers go there to discovers,
ancient ruins of history.
But, most of them are
still a great mystery.

Pantheist Prayer

Aishwi Mitra

(Class XII)

The wind that is ever present in all corners of the world,
That which belongs to sea and storm
And, upon softly touching
A fresh foliage of leaves, newly formed
Bathed in the glory of dawn
Makes them dance and whisper
As they, with their infinite power, compel the divine to stir
From her ancient, wakeful slumber
That very wind has enveloped my soul.
Say,
Why shall you ever think to contemplate
The things that lie across on the other shore,
When this breath itself has shown you that eternal truth?

The fire that floods the skies at sundown,
And at rise lights a gentle flame
That which lies hidden in plain sight,
And with its influence, sets human passions aflame
The scarlet of that fire has awakened in my heart.
At the temple afar, they bring a living creature
To offer in worship at the Mother's feet.
Say,
Why shall you need to spill this blood,
Whilst it flows sacred throughout your being?

(D/o, Arpita Ghosh Mitra (PhD Biotech, 2010))



ଅମ୍ପାତି ୨୦୨୫-୨୬

Sometimes

Srabani Biswas

(Com. Lit. 2008)

Sometimes all you need is the silence,
the silence of deep, dense, dark forest
with minimum sunlight and peaceful
shade of gigantic trees.

Sometimes all you need is the sound,
the sound of humming birds, chirping
squirrels, buzzing bees, ever-flowing
mountain streams, toddler breeze
passing through tree leaves.

Sometimes all you need is the slowing down,
like the moon behind clouds, a child in
its mom's bosom, a kitty in its couch,
a tired soul near fire.

Sometimes all you need is the speeding up,
like a faun to match the rhythm
of its mom's steps, a first glaring ray of
the Sun to make the Earth bright
better, a mountain river to meet its
destination sooner or later.

Sometimes all you need is the smile,
like the child's eye smile seeing its
mother, the blossom smiles looking
at the first ray of the sunshine,
the man smiles looking at the
at last train that will carry him where
he is to be destined.

Sometimes all you need is to cry,
like thirsty summer months, cry
for the rain, the grey winter
cry for the rays of hope in vain.
Sometimes you need a hand to
hold you tight, lips for promising
plight, arms to feel safe and
light, a company that is sprightly bright.

And trust me!! All your silence,
sounds, slowing down, speeding up,
smile, laughter, cry will be
enchanting in those arms holding those hands.

The Tame Tears

Mankhushi*

And then one day, my tears dried up-
It wasn't because my grief turned into
my reasons of happiness,
Or, my matured psyche scolded it's immature kernel.
They neither dried up due to increasing incalescence,
Nor due to any tempest.

They dried up due to
Abandonment, Abolishment, Aridity-
Due to the unintentional ignorance
That my heart failed to realise
as a part of the Journey called,
'Life'!

Nowadays, they don't drip down my cheeks
Neither, moisten my pillows.
Nowadays they simply vapourize,
Much before they plan to arise.

And then one day, my tears dried up-
Not because I became strong,
But because the world gave me reasons
To keep quiet even though, I am not wrong!

(*D/O Bidyarthi Dutta, PhD,
Library & Information Science, 2008)



Essence of Life

Nandita Saha

Orchi lives in her 8th floor, 1000 sq. feet flat, in a posh area of Delhi. Orchi is a house wife, always busy with her household works. Subir, her husband is in a MNC, busy in tour.

Newly married Orchi dreams a lot, likes to mix up with other, likes to cook, and is a sweet heart soft spoken lady. Painting is her hobby, cleanliness is her top priority. Within a very short time she became very dear one to her neighbours. As she is from a small subdivision town, Subir thought she may take time to be familiar with modern, mechanical city lifestyle. But Subir was proved wrong.

But this cheerful, lady is a little irritated nowadays. A pigeon couple started staying in the gulgulli of her veranda. As its natural instinct, pigeon couple make her veranda dirty. Maid, Lokkhi also threatened Orchi,

Boudi, I will not work in this way. I cannot cope up with such dirt. So nasty, potty potty all over veranda. Do something or ami kaaj chere debo.

Don't leave me Lokkhi, you know right now I need you. Don't worry, I will oust them soon. Wait for two three days.

But that day one more disgusting surprise was waiting for her. Orchi never thought of it. It was beyond her imagination! Two eggs in the nest! Oh nooooo! That means two more pigeon! Two +two = Four! More dirt, more potty, more twigs will be scattered all over the veranda! This is too much! Orchi immediately tried to flew the pigeon couple

away. Orchi made hissing sound, huussshhh! Huussusshh! Kobutor jah! Pala!

Pigeons flew away. Orchi a little relaxed. Oh no, within a while they came again and the Maa pigeon sat on the eggs tightly. Maa pigeon so stubborn showed no sign to fly away.

Oh maa! How can she get rid of this pigeon family!

Sima Boudi, Orchi's next door neighbour. When Orchi came as a new bride, it is Sima Boudi who gave her a very warm welcome. Her first meal in Delhi was prepared in Sima Boudi's kitchen. Sima Boudi, herself prepared all cookings. Orchi was welcomed with all her favourite dishes. Sima Boudi served Vaja Muger Dal, Kumroful Vaja, Sukto, Chaler Ghonto, Chingri Posto, and Kosha Mangso. Nalen Gurer Payesh was also served as dessert. It was a party in honour of Orchi, like fresher's welcome. Orchi was overwhelmed.

From that day Sima Boudi became her nearest, dearest one, one of her own. Every evening they sit together with all their gossip, lovely stories of conjugal life, jokes, banter, sometimes pnp. They go for a stroll, or shopping. Sima Boudi's husband works in the same company. Both Subir and Sima Boudi's husband return at same time. Orchi says 'oh, for you only, Boudi, that I never feel lonely, I don't feel the lack of my Maa, Bon, and Baba. Whenever any problem, Orchi discusses with Sima Boudi.'

Soon Orchi rushed to Sima Boudi. Sima Boudi a little stunned,



— Are you ok?

— Oh no, Boudi.

— Then go to doctor, don't waste your time.

Oh, can you feel!

— Not yet.

— Accha, then wait for ୮ days more.

— Boudi, my problem is that Kobutor couple. It laid eggs. Lokkhi also going to leave me.

— (A smile on Sima Boudi's face) O tai balo. Listen, you fiddle those eggs with a jharu, or take eggs in hand and shake. Maa kobutor will not sit again, eggs will be spoiled.

— Oh Boudi, soon I will do it.

— But don't rush in this way, you may slip.

— Sotti Boudi, tumi katto valobaso amake.

Orchi came back. With a mischievous smile on face she went straight to veranda, ha ha, now I will give you Uchit Shiksha. As she stepped in veranda with a big jharu in her hand, the maa pigeon flew away a little distance. Maa pigeon vehemently watching what is going to happen! Its eyes were fixed on eggs. Orchi looked at the pigeon, 'look what I do! you shoitan, making my veranda dirty!'

Orchi came close to the nest, wow two big eggs shining bright! Orchi waved the jharu upward to have a strong blow on eggs. But, oh my god! Orchi sat down! A few seconds! What happened! Her eyes sparkled. Oh no! It is moving! Yes it is moving! She can feel something kicking hard within! But it's so sweet, so pleasing. Oh my god! She is 6 months pregnant. First time baby inside

started moving! Orchi can hear a voice, I am coming, I am coming. What a thrill! Baby started moving. Shower of happiness surrounded her.

Such a celestial feeling! Now the baby got life and Orchi can feel essence of life.

Orchi sunk in deep dream. She can see tiny toddler moving around, her home is filled with sweet mumbling. Oh, of course she must be careful of her baby yet to born. she must save the baby in any calamity. Must not any harm come to the baby, her all love, all happiness. Baby is gradually approaching.

Orchi came in and lay on bed. Put her hand on belly to enjoy the tiny kick. Soon the maa pigeon flew and sit again on her eggs to hatch. Through the glass window and sliding glass door Orchi saw the maa pigeon; oh that maa kabutor is looking so afraid, trying to save her eggs anyway. Like Orchi, she also wants to hatch her chick safely. The MOTHER in Orchi cried, don't spoil the eggs, and don't kill the new life inside. Let the life come and enjoy the light of world. Their mother is waiting.

Orchi murmured, 'Oh maa, ki paap I was going to commit! I was going to destroy a mother's happiness! Thank GOD, the Creator stopped me.'

A radiant smile spread across her face. Both the maa are now relaxed, only waiting for the special day. They are waiting eagerly to get essence of life.

(w/o Indrajit Saha, ME, Elec. & CS, 1989)



Mitochondria: An Unrepayable Debt to My Mother

Arpita Ghosh Mitra

(PhD LS & Biotech, 2010)

In every cell of our body, in the quiet processes that sustain life, there exists a small yet powerful organelle, the ‘Mitochondrion’ which is referred to as the “powerhouse of the cell”. Mitochondria do much more than just produce energy. This organelle is not just connected to biology, it is connected to inheritance and memory, in a profound sense, a debt to my mother.

The Science of Maternal Legacy

Mitochondria are unique among the cellular organelles, as they possess their own genetic material, mitochondrial DNA (mtDNA). MtDNA is passed almost exclusively from mother to child as paternal mitochondria are destroyed in the embryo. Thus, every mitochondrion in our body is derived from our mother, and from her mother before her, forming a continuous maternal lineage stretching back through time. This uniparental inheritance allows researchers to trace ancestry and evolutionary pathways, which entirely belongs to our mothers; fundamental, functional and enduring.

Energy, Endurance, and Existence

Mitochondria are indispensable for life by determining vitality and resilience. Through oxidative phosphorylation, they generate ATP

which is the molecular currency of energy which helps to continue every heartbeat, every thought, every movement of our entire life. When diseases disrupt cellular respiration, causing initiation of other diseases through metabolically connected pathways, it is often mitochondrial dysfunction at play.

Our strength is inherited from our mothers, not just metaphorically but also biologically.

More than Biology: A Metaphor for Motherhood

Mitochondria are often overlooked, like mothers, quietly working behind the scenes to sustain life. They do not seek attention, but without them our entire existence would collapse. Mitochondria are the unseen architects of endurance; they protect and energize at a cellular level.

The Weight of Inheritance

Inheritance is not always benign. Mutations in mitochondrial DNA can lead to a range of disorders, often affecting high energy demanding organs viz. the brain, muscles, heart. Mitochondrial mutations play a crucial role in oncogenesis and tumor progression. Mitochondrial dysfunction associated diseases remind us that this maternal



অম্প্রতি ২০২৫-২৬

legacy carries both strength and vulnerability.

The idea of a “debt” thus becomes complex. It is not something to be repaid, but to be understood, respected, and carried forward.

Evolutionary Echoes

As per the Endosymbiotic theory, mitochondria are believed to have originated from ancient symbiotic bacteria that entered a mutually beneficial relationship with primitive eukaryotic cells. These cellular organelles are ancient survivors, passed down through billions of years. Thus, when we speak about maternal inheritance from a biological point of view, we are not just referring to our immediate mothers, but to an unbroken chain of life that connects us to the earliest forms of existence.

Personal Reflection: Scientific Gratitude

As someone engaged in scientific inquiry, particularly in areas involving cellular biology of diseases, explorations of mitochondrial genetics

are deeply engaging and become something profoundly personal.

To say ‘I owe my mitochondria to my mother’ is not just scientifically accurate, but also emotionally resonant. It acknowledges that the energy enabling my thoughts, my work, my aspirations is a gift that has been passed down through her.

Conclusion: An Unrepayable Debt

The phrase “a debt to my mother” suggests an obligation. This should be reframed when it is about mitochondrial inheritance because “it is not a debt to be repaid, but a legacy to be honored”.

We are literally unable to return what has been given at such a fundamental level, but this can be recognized with respect, biologically and emotionally. Truly within each of us lies a living tribute, a cellular reminder that we are shaped and sustained by our mothers.

And for that, the debt remains unpayable, yet profoundly cherished.



**PLEDGE FOR
ORGANS &
TISSUES**

Give the Gift of Life

One Pledge Can Save Multiple Lives

SCAN THE QR CODE
— TO PLEDGE —

or visit:
www.notto.abdm.gov.in



♥ Donate Life • Inspire Hope • Save Lives



Gratitude

Krishnendu Kishore Dutta

(IEE, 1986)

“Our deepest gratitude must to God for the wonderful things He gives us. It is God who really supplies all our needs and takes care of us in every way. Only those who have pure, divine love for Him will be able to see His hidden hand at all times, thereby express to Him their ceaseless gratitude.”

— H.H. Swami Sivananda, *Divine Life Society, Rishikesh*

Proposal for Magazine publication was put forth after Dr. Triguna Sen Memorial lecture in the month of March’2026. All EC members were requested to contribute any article for the same. Later there was sincere follow up for contribution by our Secretary. I am not a writer and my knowledge in English is very poor, however as I was expected to contribute I was contemplating on the subject/theme. On contemplation a thought came to scribble a few lines on Gratitude. In my opinion Alumni Association is a medium through which one can express one’s gratitude to one’s Alma Mater.

I recollect lecturers by Dr. Triguna Sen, our 1st Vice Chancellor during his visits during 1984-1986 while he presided over Re Union Meetings and Conferences arranged in the University Campus. During his talk(s) he would certainly mention about Gratitude. He used to emphasis that in making of a person as a successful individual, apart from Parents and family, there are many others in the society with whom we interact on a daily basis who also contribute and

help us achieve success. Most often we take them for granted and never introspect and realise that without their help and support success would not have been possible.

Gratitude is the positive emotion of being thankful and appreciative for what we have, recognize goodness in life, and acknowledge kindness from others. Appreciation, Thankfulness, Gratefulness, Recognition, Obligation and Acknowledgement are various forms of Gratitude. Gratitude with in us can be strengthened by adopting any of the above aspects in our practices and attitude.

Gratitude is a fundamental spiritual practice that cultivates detachment, awareness, and divine connection. Being grateful for everything, including life’s challenges, strengthens the spirit, fosters compassion, and helps in overcoming the ego, ultimately turning life into a form of Sadhana. A lot can be deliberated on Gratitude. To sum up in nutshell, it shall be appropriate to mention regarding Perspectives and Practical applications of Gratitude.



Key Perspectives on Gratitude:

- **Gratitude as Spiritual Practice:** Expressing gratitude is considered a vital spiritual practice that elevates consciousness, fostering a connection with the divine spirit and bringing inner healing.
- **Overcoming Ego:** Gratitude arises when one moves beyond the ego's sense of entitlement, recognizing that true peace comes from acknowledging the source of all blessings.
- **Daily Life and Service:** Gratitude is not merely for grand gestures, but for daily opportunities to serve and show compassion. Offering thanks in difficult moments can still bring joy.
- **Detachment and Growth:** Spiritual Leaders have encouraged maintaining gratitude while witnessing the unfolding of life and the development of one's mission, as exemplified by their detachment and focus on service to humanity.

Practical Applications:

- **Daily Reflections:** Reflect on blessings, such as health, shelter, and relationships.

- **Maintaining Joy:** Gratitude is portrayed as a tool to maintain a 'heart full and light', fostering inspiration and optimism.
- **Channelling Grace:** Recognizing and thanking the divine for the grace that flows in one's life.

To sum up, Alumni Association is a medium through which one can express one's gratitude to one's Alma Mater. Gratitude is a value which in my opinion exists in all creatures and it is high within we Homo sapiens as we are considered to be more wise and intelligent out of all living creatures. It is this quality of gratitude which is the invisible thread which has kept us together, and in future too.

Long live Jadavpur University Alumni Association!

References:

- Teachings of Paramhansa Swami Satyananada Saraswati, Founder President, Bihar School of Yoga.
- Talks by Dr. Triguna Sen, 1st Vice Chancellor, Jadavpur University.
- Excerpts from Wikipedia.

Process of Pledging an Organ for Donation in your lifetime.

- **Learn about organ donation and its impact**
- **Decide to become a donor and inform your family**
- **Register as an organ donor through NOTTO or state portals**
- **Carry a donor card and let your loved ones know your wishes**
- **In the event of brain death, medical professionals will assess your organs' suitability for donation**





Char Dham Yatra

Prasun Kumar Dutta

(EE, 1982)

On evaluation of several post superannuation business options, an intriguing idea caught my attention and that was the profession of delivering religious discourse. I could realize that the business offered lucrative opportunities provided my discourses are innovatively designed and differentiated, to put me ahead of competition. My thought process culminated to the idea of smartly integrating religion with science and offering discourse cocktails to the target clients, the wealthy and upwardly mobile intellectuals. Such clients were aplenty in India but I understood for an emerging guru like me it would be difficult to position myself here. I rightfully focused on the US where I thought it would be easier to identify patronizing clientele among the opulent Indian diaspora who had the right blend of wealth, intellect and spiritual inclination I was looking for

Indeed, I am a very successful and globally sought after spiritual guru today but success did not come on a silver platter, I had to work hard and struggle at every step to reach where I am today and that is why my first religious discourse has remained immensely nostalgic, inspiring me to write about this here.

The topic of my first discourse was “Four Point Holy Journey” or “Char Dham Yatra” as it

is popularly known, meaning the journey to the four destinations of divine holiness.

Often this Char Dham Yatra points to the travel package of four holy destinations in the Himalayas - Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri- offered by the Indian tour operators. But these are not real “Char Dham” of India. The real ones are Badrinath in the north, Puri in the east, Rameswaram in the south and Dwarka in the west. This is of course logical as we believe God is impartial and He does not have any regional preference. Badrinath is located amidst the snowcapped Himalayan summits and the other three destinations are located on the coast lines.

If you need to understand the true significance of “Char Dham”, you need to know how God spends His time. Dwarka is the place where God rests at night, I am using the word ‘rest’ assuming He does not sleep. He gets up early in the morning and travels down to Rameswaram to have His daily swim in the sea followed by breakfast. After breakfast, He goes to His work place at Badrinath conveniently located amid the laps of the Himalayan peaks. He takes His lunch at His favorite restaurant inside the Jagannath Temple of Puri, then travels back to Badrinath to complete His work of the day and finally in the evening reaches Dwarka to have dinner and retire to bed.



Deeper understanding of God's movement calls for familiarity with the relativistic nature of time as Einstein taught us. God has His personalized time distinct from our own. We do not exactly know how our time is related to God's but we believe God is dynamic, moving always at a very high speed and thus His personal time is slower than ours making one Godly day perhaps equal to a few thousand days on our earth.

God is always in quantum state and so Heisenberg's "Uncertainty Principle" applies to Him. We cannot accurately measure both speed and position of God at the same instant, the more accurately we determine His position, the more erroneous will be the measurement of His speed. This physical limitation imposed by God Himself coupled with lack of our knowledge of His personalized time makes sighting of God and so directly proving His existence absolutely impossible!

Friends, God can travel even faster than light and therefore, in conformance with the theory of relativity, He can also move backward in time.

God being omniscient knows our good intention to accomplish "Char Dham Yatra". He encourages us to do it in a proper sequence based on the latest spiritual rule of Degree 4 Divinity (D4D). This rule defines Divine Affinity (DA) in 4 degrees 1, 2, 3 and 4, the larger the number, the stronger is the DA.

In the beginning of your commencement of "Char Dham Yatra" you are at DA-1 level

signifying you have not yet developed even the bare minimum closeness to God. Common sense suggests if we want to meet a person, not personally known to us, we meet him at his office. Hence Char Dham Yatra should logically begin at Badrinath. At level DA-2 when God has already known you a bit, it is better to join him at a banquet buffet and that is why second destination should be Puri. There can be some debate regarding the sequence of balance two destinations, but again common sense prevails. At DA-3 level of closeness attempt should be made to target a private dinner meeting with Him and so the next destination must be Dwaraka. Rameswaram is of course the final destination at DA-4 level. God has His private swimming facility in Rameswaram and we naturally need to achieve a very high degree of divine affinity (DA-4 level) to see Him there.

I have used the words "see" and "meet" but can we really see and meet Him? The answer is a clear and bold NO.

The relativistic nature of God's own personal time and the constraints imposed by "Uncertainty Principle" will never allow us to find God in any of these "Dhams" but God will know our intent and shower his blessings, if we undertake our "Char Dham Yatra" obeying D4D principles.

Nevertheless "principles of destiny" is inviolable like the second law of thermodynamics. We cannot accomplish "Char Dham Yatra" unless we are destined to do so.

Mesmerizing Spain & Fascinating Portugal

Susmita Ray
(ET 1992)



For long I had been dreaming of visiting Spain and Portugal – the two countries that have a culture distinctly different from their European neighbours – with a splash of Mediterranean overtone. They have the Mediterranean Sea on one

side, the Atlantic Ocean on the other, with only France as the European neighbour and the narrow strait of Gibraltar connecting to the African people of Morocco. Finally, that dream came true in May of 2025. We joined a big group of 42, all Indians, under the guidance of Thomas Cook and embarked on a 13-day tour.

On our way to Madrid from Delhi, we flew via Zayed International Airport of Abu Dhabi. What a gorgeous airport it was! The long Immigration queue at Madrid reminded us that this place was hot on tourists' list.

Madrid is a city with historical monuments, palaces, plazas, fountains, churches and museums. Spain reminds of bull fight and the largest bullring of Madrid - Las Ventas Plaza de Torros - was a must see. Its ambience shows how much the Royal Family was fond of Bull

fight. Moving ahead Plaza Mayor and the heart of the city - Pureta Del Sol - stun you. Madrid Palace was an architectural marvel. Here we enjoyed 'Churas with hot chocolate', a Spanish delicacy. Post lunch we moved out of the city to the neighbouring township **Toledo**. The famous sword factory here awes you with live demo of making swords.

Next day we headed to Portugal, to **Porto**, its 2nd biggest UNESCO heritage city. On the way we stopped at the ancient fortress town of **Avilla**, then visited the old town of Salamanca, also called the golden city with all sandstone constructions. The Cathedral here is one of the top 10 cathedrals of the world. **Salamanca** University is the 3rd



Bull Ring Las Ventas Plaza de Torros



The port city Porto

oldest University in the world and Salamanca Plaza is one of the most beautiful plazas of Spain. The cobble stone roads and the ancient structures send a vibe of an old European town. Reaching Porto, we got a wonderful glimpse of Portuguese port lifestyle with massive ships, some on sail, some stationery. We saw a demonstration of wine making in the Calem wine factory.

Next day started with a long drive from Porto to **Lisbon**. The city tour started at the commercial square of Praca Do Comercio with beautiful roadside restaurants playing music, then continued to Belem Tower - from where Vasco-Da-Gama started his voyage to India, the Jeronimos Monastery at a small hill top, the main boulevard - Avenue Liberta - with major brand shops on the sides and the grand suspension bridge, the 25th April bridge, named in memory of the great Portuguese revolution of 1974. Post lunch we visited the ancient town of **Sintra** with its lovely palace and fortress. Towards evening we landed in the western most point of the European



Belem Tower from where Vasco-Da-Gama started his voyage to India

continent, Cabo da Roca, a cape right on the Atlantic Ocean. The extremely high-speed wind over the sea almost flies you off as the waves lash on the ground below.

From Portugal we took a long drive back to south of Spain, to the picturesque city of **Seville** situated on the bank of River Guadalquivir. We had a grand tour of Plaza Espana and the Cathedral on a decorated carriage pulled by two majestic horses. In the evening we watched the enchanting “Flamenco dance” show – a heritage of Spanish culture. Flamenco is a traditional art form, deeply rooted in Spanish culture that combines singing, dancing and guitar playing.



Live Flamenco Dance

Next morning we headed for **Costa Del Sol** – the Coast of the Sun- in southern Spain. On our way we halted at **Cordoba** to visit the majestic Mezquita (Spanish for Mosque), also called the Mosque-Cathedral. It had been a huge old mosque which later was transformed in parts to a Cathedral. It has an amalgamation of Islamic and Christian architectures with domes, columnar arches, and mosaics influenced by Persian and Byzantine architecture. Its intricacy is overwhelming. Next, we drove through the town of **Malaga** which boasted of the sprawling



Inside Mezquita

first multi-branded designer outlet complex of southern Spain, McArthurGlen.

Next morning we enjoyed the beautiful calm and quiet beach at Costa Del Sol. This beach is on the southern end of Spain where the Strait of Gibraltar connects Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea. The panoramic view of it was mesmerizing.



The Alhambra Complex

Afterwards we drove towards east to **Granada** to visit the Alhambra Complex - a UNESCO world heritage site, a palace and fortress from medieval Islamic world, with its elaborate Generalife Garden - on a walking tour. Evening we had a lavish Spanish dinner at a locally famous

restaurant with an elaborate menu from Spanish cuisine. The food was very delicious and its ambience made us spell bound.

Our next destination was **Valencia**, a major tourist attraction on the mid-eastern coast by the Mediterranean Sea. The long drive gave ample opportunities of taking breathtaking views of snow-clad mountains of Sierra Nevada range. The city tour to the “Arts and Science City” gave some splendid views of modern architecture, then to the iconic square “Plaza Reina” with a walking tour of the stunning Cathedral complex.

Next, we drove towards north along the Mediterranean Sea to our last destination



Snow-clad mountains of Sierra Nevada range

Barcelona. We visited the Olympic games village and took a walking tour of Montjuic, the “Jewish Mountain”, on a shallow hill, regarded as the birthplace of the city, with a Castle and a Jewish cemetery. Post lunch we spent a good time at the crowded Barcelona beach.

Next morning we went to see Sagrada Familia, the beautiful church which is “under construction” for centuries, the largest unfinished Catholic church in the world, with an overwhelming architecture. Later we visited Montserrat, a multi-peaked rocky range that houses the virgin of Montserrat and Spain’s first national park. Post lunch we spent long time walking leisurely in La Rambla street, the main shopping street with lots of souvenir shops and restaurants.

This splendid trip of my dreamland finally ended. It had a blend of history, art, culture, marvellous architecture, picturesque seabeaches and mountains. We flew back home with pleasant memory and camaraderie of the group which I will treasure for a lifetime.





অম্প্রতি ২০২৫-২৬

Give Blood, Save Lives: Myths vs. Facts

MYTH



Myth: Donation is harmful or takes too long.

Many believe it's painful and time-consuming, causing lasting weakness.



Myth: One person's donation doesn't matter.

Some think their individual contribution is insignificant in the grand scheme.



Myth: Donating blood makes you less healthy.

A common belief is that donation weakens the immune system and harms the heart.

FACT



Reality: It is a safe, sterile 30-minute process with fluids replenished in 48 hours.



Reality: Just one unit of donated blood can save up to three lives.
Components like red cells, plasma, and platelets from one donation help multiple patients.

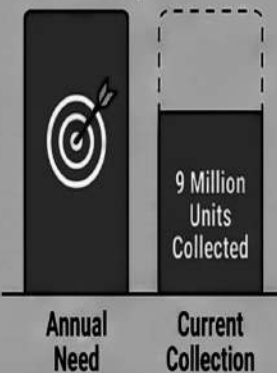


Reality: Regular donors are 88% less likely to suffer a heart attack.

Regular donation helps reduce excess iron levels, improving cardiovascular health.

THE URGENT NEED & ELIGIBILITY

12 Million Units
Needed Annually



3 Million Unit Annual Shortage

India faces a critical deficit; Active community participation is essential to closing this critical gap

Who Can Donate?



Constant Need for Stocks

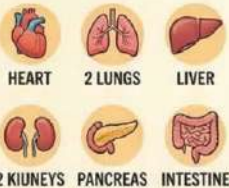


Donated blood has a limited shelf life, requiring a continuous supply of volunteer donors to maintain adequate stocks.

PLEDGE TO DONATE ORGANS. GIVE THE GIFT OF LIFE.

ONE ORGAN DONOR
CAN SAVE UP TO
8 LIVES.

ORGANS YOU CAN DONATE:



ONE
DECEASED
DONOR



ONE
DECEASED
DONOR

TISSUES YOU CAN DONATE:



LEAVE A LEGACY OF HOPE



GIFT A SECOND CHANCE



TALK TO YOUR FAMILY.



SCAN TO PLEDGE.

VISIT & REGISTER AT:
notto.abdm.gov.in



24x7 TOLL-FREE HELPLINE:
1800-11-4770



NATIONAL ORGAN & TISSUE
TRANSPLANT ORGANIZATION (NOTTO)

Ministry of Health & Family Welfare,
Government of India



A Campaign by Alumni Association NCE Bengal & Jadavpur
University, Delhi Chapter (AANCEBJU-DC), <https://jualumnidelhi.org>